নেতাজী সুভাষচন্দ্রের

আত্মজীবনী

সিগনেট প্রেস | কলিকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ ১৩৫২

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০/২ এলগিন রোড

কলিকাতা ২০

অনুবাদ করেছেন

সুভাষ সেন

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সহায়তা করেছেন

শিবরাম দাস

মুদ্রাকর

শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ

৩২ আপার সারকুলার রোড

আর্টপ্লেট ছেপেছেন

গসেন অ্যান্ড কম্প্যানি

১ শুর্ট স্ট্রিট

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৬৯/১ মির্জাপুর স্ট্রিট

[illegible]ড়ে চার টাকা

ভারত পথিকের

বিক্রয়লব্ধ অর্থের

অধিকাংশ

সুভাষ ইন্স্টিটিউট

অফ কালচারে

প্রদত্ত হবে

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও শৈশব

ঊনিশ শতকের শেষভাগে আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু বাঙলাদেশ ছেড়ে উড়িষ্যায় গিয়ে আইনজীবী হিসেবে কটক শহরে বসবাস করতে শুরু করেন। এই কটকে ১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারি শনিবার আমার জন্ম। আমার পিতা ছিলেন মাহিনগরের বসুপরিবারের ছেলে, আর মা প্রভাবতী দেবী হাটখোলার দত্ত পরিবারের মেয়ে। আমি পিতামাতার নবম সন্তান এবং ষষ্ঠ পুত্র।

আজকাল কলকাতা থেকে কটকে যাওয়া অতি সহজ ব্যাপার। কলকাতা থেকে ট্রেনে পূর্বতটরেখা ধরে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে এক রাত্রের মধ্যেই কটকে পৌঁছন যায়। পথ অত্যন্ত নিরাপদ, কাজেই কোনোরকম বিপদ আপদের আশঙ্কাও নেই। কিন্তু বছর ষাটেক আগে অবস্থা মোটেই এরকম ছিল না। স্থলপথে গরুরগাড়িতে গেলে চোরডাকাতের কবলে পড়বার আশঙ্কা থাকত, আবার জলপথে ভয় থাকত ঝড়তুফানের। কিন্তু ভগবানের রোষ থেকে রেহাই মিললেও মানুষের হিংস্রতা এড়ানো প্রায় অসম্ভবই ছিল, তাই বেশির ভাগ লোকই জলপথে যাতায়াত করত। চাঁদবালি পর্যন্ত জাহাজেই যাওয়া যেত—চাঁদবালি থেকে স্টীমারে অনেকগুলি নদী খাল পেরিয়ে কটক। ছেলেবেলা থেকে মায়ের মুখে এই সমুদ্রযাত্রার যে ভয়াবহ বিবরণ,

শুনেছি তারপর আর কখনো আমার সমুদ্র ভ্রমণের ইচ্ছে হয়নি। তখনকার দিনে অত বিপদ আপদের মধ্যে আমার পিতা তাঁর পৈতৃক ভিটে ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণ করতে যে এতদূর আসতে পেরেছিলেন তাতেই বোঝা যায় তাঁর বুকের পাটা কতখানি ছিল। এই দুঃসাহসিকতার পুরস্কারও তিনি পেয়েছিলেন. আমার যখন জন্ম হয় ততদিনে তিনি বেশ প্রতিপত্তি করে নিয়েছেন এবং উড়িষ্যার আইনব্যবসার ক্ষেত্রে বলতে গেলে তিনি শীর্ষস্থানটি অধিকার করেছিলেন।

কটক শহরটি আয়তনে বিশেষ বড় নয়, লোকসংখ্যাও মাত্র ২০,০০০ হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু তা হলেও কতকগুলি বিশেষত্বের জন্য কটক ভারতবর্ষের একটি প্রধান শহর। কলিঙের হিন্দুরাজাদের আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কটকের ইতিহাস এক অবিচ্ছিন্ন মর্যাদার দাবি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কটকই ছিল উড়িষ্যার রাজধানী এবং পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির, কোনারক, ভুবনেশ্বর ও উদয়গিরির জগৎবিখ্যাত শিল্পনিদর্শন কটকেরই দান। তাছাড়া কটক যে শুধু উড়িষ্যার বৃটিশ সরকারেরই প্রধান দপ্তর ছিল তা নয়, উড়িষ্যার বহু সামন্তরাজাদেরও শাসনকেন্দ্র ছিল। সব মিলিয়ে এখানকার পরিবেশ শিশুমনের সুস্থ সবল হয়ে গড়ে ওঠার অনুকূলই ছিল। শহরের এবং গ্রাম্যজীবনের—দুয়েরই সুবিধে কটকে পাওয়া যেত।

ধনী না হলেও আমাদের পরিবারকে সঙ্গতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ফেলা চলত। কাজেই অভাব অনটনের অভিজ্ঞতা কখনো আমার হয়নি, আর অভাবের তাড়নায় লোভ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি যেসব মানসিক দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে সেসব সংকীর্ণতাও আমার

মনে স্থান পায়নি। আবার মাথা বিগড়ে দেবার মতো বিলাসী বেহিসাব। অভ্যাসকেও কখনো বাড়িতে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের বাপমা একটু বেশিরকম সাধাসিধে ভাবেই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছিলেন।

মনে পড়ে ছেলেবেলায় নিজেকে কি রকম যেন তুচ্ছ মনে হত। বাবামাকে সাংঘাতিক ভয় করতাম। বাবা সাধারণত এমন গম্ভীর হয়ে থাকতেন যে আমরা কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষতেই সাহস পেতাম না। আইনব্যবসা তো ছিলই, তার উপরে বাইরের আরো কত কাজ যে তাঁর থাকত তার ইয়ত্তা নেই, ফলে সংসারের দিকে নজর দেবার মতো অবসর তিনি সামান্যই পেতেন। এই সামান্য সময়টুকু তাঁকে সব সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হত। সবচেয়ে ছোটো যে, তার ভাগে অবিশ্যি আদর একটু বেশিই পড়ত, কিন্তু তাও বেশিদিন স্থায়ী হত না, ঘরে নতুন অতিথির আবির্ভাব হলেই বাড়তি ভাগটুকু নবাগতের জন্য বরাদ্দ হত। বড়দের ব্যাপারে বাবা এত নিরপেক্ষ ছিলেন যে ঘুণাক্ষরেও কখনো বোঝা যেত না তিনি কার সম্বন্ধে কী ভাবতেন। মাও ছিলেন অনেকটা বাবারই মতো। অবিশ্যি মন তাঁর স্বভাবতই বাবার চাইতে কোমল ছিল, এবং সময়ে সময়ে তাঁর পক্ষপাতিত্ব যে টের পাওয়া যেত না তা নয়, তা সত্ত্বেও আমরা সবাই মাকে দস্তুর মতো ভয় করে চলতাম। বাড়িতে কেউই তাঁর কথার উপর কথা বলতে সাহস করত না। সংসারের পূর্ণ কর্তৃত্বের ভার ছিল তাঁর উপর। তাঁর এই প্রতিপত্তির মূলে ছিল তাঁর অসাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি আর প্রখর ব্যক্তিত্ব। ছেলেবেলা থেকেই বাবামাকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করে এসেছি সত্যি, কিন্তু তবু তাঁদের আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানবার জন্য মন আকুল হয়ে উঠেছে—এজন্যই, যেসব ছেলেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে

তাদের বাপমায়ের সঙ্গে মিশতে দেখেছি তাদের মনে মনে হিংসে না করে পারিনি। আমার মন একটু স্পর্শকাতর, তাই বাপমায়ের এই আপাত নিস্পৃহতা আমাকে বেদনা দিয়েছে। শুধু যে বাপমায়ের কাছ থেকে ভয়ে ভয়ে দূরে থাকতে হত বলেই আমার দুঃখ ছিল তা নয়, আমার বড় অনেক ভাইবোন থাকায় নিজেকে খুঁজে পেতেই যেন কষ্ট হত। একদিক দিয়ে এতে অবিশ্যি ভালো বই মন্দ হয়নি। দাদাদের মতো হতে হবে—এই সংকল্প নিয়ে আমি বড় হয়ে উঠেছি। নিজের সম্বন্ধে বিশেষ উঁচু ধারণা আমার কখনো ছিল না, তাই সব কাজেই আমার অত্যন্ত সাবধানে চলা অভ্যাস। আর যত কঠিন কাজই হোক না কেন, কখনো ফাঁকি দেবার কথা আমার মনে হয়নি। তাছাড়া, আমার অবচেতন মনে এ ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে সাধারণ লোকের পক্ষে কৃতকার্যতা লাভের একমাত্র উপায় কঠিন পরিশ্রম ও নিষ্ঠা।

বড় পরিবারে মানুষ হওয়া অনেক দিক দিয়েই বিড়ম্বনা। ছেলেবেলায় যে জিনিসটি অত্যন্ত দরকার—ব্যক্তিগত মনোযোগ—বড় পরিবারের লোকারণ্যে সেটা কোনোমতেই সম্ভব হয় না। তার উপরে অনেকে একসঙ্গে থাকলে নিজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবার সুযোগ ঘটে না, ফলে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না। বড় পরিবারের সুবিধেও অবশ্য আছে। অনেকের মাঝে থাকার ফলে স্বভাব সহজেই সামাজিক হয়ে ওঠে—আত্মকেন্দ্রিকতা প্রশ্রয় পায় না। আমাদের বাড়িতে বেশি লোক বলতে শুধু আমার ভাইবোনেরাই নয়, খুড়তুতো, পিসতুতো, মামাতো ভাইবোন আর কাকা, মামা ইত্যাদি মিলে বেশ একটা বড় অঙ্ক দাঁড়াত। এর উপরে আত্মীয়স্বজনের ভিড় তো প্রায় লেগেই থাকত। আর ভালো হোটেলের অভাবেই

হোক বা আমাদের অতিথিপরায়ণতার খ্যাতির জন্যই হোক কোনো গণ্যমান্য লোক কটকে এলে আমাদের বাড়িতেই তাঁর আতিথ্যের ব্যবস্থা হত।

আমাদের পরিবারের লোকের সংখ্যা বেশি বলেই যে সংসার এত বড় ছিল তা নয়, পোষ্যবর্গ ও চাকরঝির সংখ্যাও ছিল অগুনতি। তার উপরে গরু, ঘোড়া, ভেড়া, হরিণ, ময়ূর, বেজি ইত্যাদি মিলিয়ে ছোটোখাটো একটা চিড়িয়াখানার সামিল। বহুদিন থেকে কাজ করার ফলে আমাদের চাকরঝিরা ঘরের লোকের মতোই হয়ে গিয়েছিল। অনেকে তো আমার জন্মের বহু আগে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে ঢুকেছিল। আমরা ছোটোরা স্বভাবতই এদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতাম। বিশেষ করে আমাদের বুড়ি দাসীকে তো বাড়ির সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা করত। তখন পর্যন্ত চাকরঝির সঙ্গে আমাদের প্রভুভৃত্য সম্পর্ক দাঁড়ায়নি—তাদের আমরা পরিবারভুক্ত বলেই মনে করতাম। চাকরবাকরদের সম্পর্কে আমার ছেলেবেলার এই মনোভাব বড় হয়েও কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি।

বাড়ির এই অনুকূল আবহাওয়ায় আমার মন স্বভাবতই উদার হয়ে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটা সংকোচের ভাব মনকে অন্তর্মুখী করে তুলেছিল—আজ পর্যন্ত এই সংকোচ আমি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

বংশ পরিচয়

আমাদের পরিবারের ইতিহাস প্রায় সাতাশ পুরুষ পর্যন্ত পাওয়া যায়। বোসেরা জাতে কায়স্থ। এই বোসেদের দক্ষিণ রাঢ়ী শাখার প্রতিষ্ঠাতা দশরথ বোসের দুটি ছেলে, কৃষ্ণ ও পরমা। এঁদের মধ্যে পরমা পূর্ববঙ্গে বসবাস করতেন, আর কৃষ্ণ পশ্চিমবঙ্গে। দশরথ বোসের একজন প্র-প্রপৌত্র মুক্তি বোস কলকাতা থেকে ১৪ মাইল দূরে মাহিনগরে বাস করতেন, সেই থেকেই এঁরা মাহিনগরের বসুপরিবার নামে বিখ্যাত। দশরথের দশ পুরুষ নিচে মাহিপতি—ইনি অসাধারণ জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। বাঙলার তৎকালীন রাজা তাঁকে অর্থ ও সমর সচিব নিযুক্ত করেন এবং তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি দেন। সে সময়কার প্রথা অনুসারে মাহিপতি পুরস্কার স্বরূপ রাজার কাছ থেকে জায়গীরও পেয়েছিলেন—মাহিনগরের কাছে সুবুদ্ধিপুরই বোধ হয় সেই জায়গীর। মাহিপতির দশ ছেলের মধ্যে চতুর্থ ঈশান খাঁ বিখ্যাত। রাজদরবারে মাহিপতির স্থান ঈশান খাঁ-ই দখল করেছিলেন। ঈশান খাঁর তিন ছেলে—তিনজনই রাজার কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন। মধ্যম ছেলে গোপীনাথ অসাধারণ বীর ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁকে তৎকালীন সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) অর্থসচিব ও নৌসেনাধ্যক্ষ

নিযুক্ত করেন এবং পুরন্দর খাঁ উপাধি দেন। এ ছাড়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে মহিনগরের কাছে একটি জায়গীর দেন—পুরন্দর খাঁর নাম অনুসারে এখন ঐ জায়গার নাম পুরন্দরপুর। পুরন্দরপুরে 'খাঁ পুকুর' নামে এক মাইল দীর্ঘ একটি পুষ্করিণীর ভগ্নাবশেষ এখনো আছে। মহিনগরের কাছে মালঞ্চ নামে যে গ্রামটি আছে সেটি পুরন্দরের বাগানের উপর গড়ে উঠেছিল। সে সময়ে হুগলি নদী মহিনগরের খুব কাছ দিয়ে বয়ে যেত। শোনা যায় পুরন্দর নাকি নৌকায় হুগলি দিয়ে বাঙলার তৎকালীন রাজধানী গৌড়ে যাতায়াত করতেন। তাঁরই চেষ্টায় একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে উঠেছিল। সমাজসংস্কারক হিসেবেও পুরন্দরের দান কম নয়। তাঁর আমলের আগে বল্লাল্লী রীতি অনুসারে কায়স্থদের দুটি বিভাগ কুলীন (ঘোষ, বোস, মিত্র) ও মৌলিকের (দত্ত, দে, রায় ইত্যাদি) মধ্যে বিবাহ চলত না। পুরন্দর নতুন নিয়ম করলেন যে কুলীন পরিবারের শুধু জ্যেষ্ঠ সন্তানকেই কুলীন পরিবারে বিয়ে করতে হবে, আর সকলে মৌলিক পরিবারে বিয়ে করতে পারবে। এই রীতি আজ পর্যন্ত চলে আসছে। এর ফলে অতিরিক্ত অন্তর্বিবাহের কুফল থেকে কায়স্থরা রক্ষা পেয়েছে। সাহিত্যিক হিসেবেও পুরন্দরের নাম আছে। তিনি অনেক বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছিলেন।

কবিরামের 'রায়মঙ্গল' ও আরো কয়েকটি বাঙলা কাব্য থেকে জানা যায় যে দুশো বছর আগে হুগলি নদী (যাকে বাঙলায় সাধারণত বলা হয় 'গঙ্গা') মহিনগর ও তার আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হত। তারপর কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন ধারা নেয়। আজও ও অঞ্চলের অনেক পুষ্করিণীকে 'গঙ্গা' বলা হয়—যেমন 'বোসের গঙ্গা'। গঙ্গার এই

পথপরিবর্তনে এইসব গ্রামের স্বাস্থ্যসম্পদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে অনেকেই এই অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এদের মধ্যে পুরন্দর খাঁর বংশধরও কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা কোদালিয়া নামে পাশেই একটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন।

কিছুদিন নির্জীব থাকার পর কোদালিয়া, চিংড়িপোতা, হরিনাভি, মালঞ্চ, রাজপুর ইত্যাদি গ্রামগুলি আবার কর্মকোলাহলমুখর হয়ে ওঠে। ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগে এই অঞ্চল শিল্প ও সংস্কৃতিতে আশ্চর্য উন্নতি লাভ করেছিল—যে উন্নতি বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তার পরেই ম্যালেরিয়া মহামারীতে দেশ একেবারে উজাড় হয়ে যায়। আজ এইসব অঞ্চলে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে জনমানবশূন্য গ্রামগুলির জায়গায় আগাছায় ঢাকা বিরাট বিরাট দালানের ভগ্নাবশেষ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

এইসব ভগ্নাবশেষ থেকেই ধারণা করা যায় কিছুদিন আগে এখানকার অবস্থা কতখানি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। একশো বছর আগে এখানে যেসব পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাকেই বহন করে এনেছিলেন, কিন্তু তাই বলে তাঁরা মোটেই প্রগতিবিরোধী ছিলেন না। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক—যে ব্রাহ্মসমাজকে তখনকার সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে দস্তুরমতো বৈপ্লবিক বলা চলত। আর কয়েকজন ছিলেন পত্রিকা সম্পাদক। বাঙলা সাহিত্যে তাঁদের দান অপরিমেয়। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ছিলেন তখনকার দিনের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী পত্রিকা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক এবং ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন প্রথম বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশে'র

সম্পাদক। এঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম। ভারতচন্দ্র শিরোমণি হিন্দুশাস্ত্রের, বিশেষ করে "দায়ভাগ" মতের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চিত্রশিল্পে কালীকুমার চক্রবর্তী এবং সঙ্গীতে অঘোর চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন্ন বসু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গত ৪০/৫০ বছর যাবৎ স্বাধীনতা আন্দোলনেও এ অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে এসেছে। বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী হরিকুমার চক্রবর্তী এবং সাতকড়ি ব্যানার্জি (ইনি ১৯৩৬ সালে দেওলি ডিটেনশন ক্যাম্পে মারা যান) এবং বিশ্ববিখ্যাত কমরেড এম্. এন্. রায় এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বোসেদের যে শাখা কোদালিয়া গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল তারা যে অন্তত দশপুরুষ পর্যন্ত সেখানে ছিল প্রাপ্ত বংশাবলী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার পিতা ছিলেন পুরন্দর খাঁর থেকে তেরো পুরুষ এবং দশরথ বসুর থেকে ছাব্বিশ পুরুষ নীচে। আমার পিতামহ হরনাথ বসুর চার ছেলে, যদুনাথ, কেদারনাথ, দেবেন্দ্রনাথ এবং জানকীনাথ—আমার পিতা।

হরনাথের আগে পর্যন্ত আমাদের পরিবার ছিল শাক্ত ধর্মাবলম্বী। কিন্তু হরনাথ ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। বৈষ্ণবধর্ম একান্ত জীবহিংসা-বিরোধী—কাজেই হরনাথ বাৎসরিক দুর্গাপূজায় ছাগবলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রতি বছর অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হত, এখনো হয়, কিন্তু হরনাথের আমল থেকে ছাগবলি আর কখনো হয়নি, যদিও একই গ্রামে বোসেদের আর একটি পরিবারে আজও ছাগবলি হয়।

ভাগ্যান্বেষণ করতে হরনাথের চারটি ছেলে এক একজন এক এক

জায়গায় গিয়ে বসবাস করেন। সকলের বড় মদনাথ চাকরি করতেন ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটে। জীবনের একটি বড় অংশই তাঁর কেটেছিল সিমলায়। দ্বিতীয় কেদারনাথ চিরকাল কলকাতাতেই কাটিয়েছেন। তৃতীয় দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষাবিভাগে সরকারী চাকরি করতেন এবং কার্যকুশলতার গুণে তিনি শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষের পদে উন্নতি লাভ করেন। কার্যোপলক্ষে তাঁকে প্রায়ই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বদলি হতে হয়েছে। চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করেন।

আমার বাবার জন্ম হয় ১৮৬০ সালের ২৮শে মে, আর মা ১৮৬৯ সালে (বাঙলা ১২৭৫ সালের ১৩ই ফাল্গুন)। কলকাতার অ্যালবার্ট স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করে বাবা কিছুকাল সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) পড়েন; পরে কটকে গিয়ে র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। এরপর আইন পড়তে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে আসেন তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন এবং সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসেন। এই সময়ে কিছুকাল তিনি অ্যালবার্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। অ্যালবার্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন কৃষ্ণবিহারী সেন। ১৮৮৫ সালে তিনি কটকে গিয়ে আইনব্যবসায়ে যোগ দেন। ১৯০১ সালে তিনি কটক মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১২ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং রায় বাহাদুর খেতাব পান। তারপর ১৯১৭ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তিনি সরকারী উকিল এবং পাবলিক প্রোসিকিউটরের পদে

ইস্তফা দেন এবং তেরো বছর পরে ১৯৩০ সালে সরকারের দমন-নীতির প্রতিবাদে রায়বাহাদুর খেতাব বর্জন করেন।

মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ছাড়াও ভিক্টোরিয়া স্কুল, কটক য়ুনিয়ন ক্লাব ইত্যাদি বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। দুঃস্থ ছাত্ররা সর্বদাই তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য আসত। তাঁর দান শুধু যে উড়িষ্যাতেই নিবদ্ধ ছিল তা নয়, পৈতৃক গ্রামের কথা তিনি ভোলেননি—সেখানে তাঁর পিতামাতার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে তিনি নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন। তাছাড়া স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তিনি কখনো প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে যোগ দেননি। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে—খাদি ও স্বদেশী শিক্ষার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বরাবরই তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন এবং দু'বার দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন শাক্ত এবং দ্বিতীয় গুরু বৈষ্ণব। বহুদিন পর্যন্ত তিনি স্থানীয় থিয়োসফিক্যাল লজ্-এর সভাপতি ছিলেন। দরিদ্র নিঃস্বদের সম্বন্ধে তাঁর মনে গভীর সমবেদনা ছিল। মৃত্যুর আগে তিনি বৃদ্ধ ভৃত্যদের ও অন্যান্য আশ্রিতদের সম্বন্ধে যথাযোগ্য সংস্থান করে গিয়েছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদেই বলেছি আমার মা ছিলেন হাটখোলার দত্ত-পরিবারের মেয়ে। হাটখোলা উত্তর কলকাতার একটি অংশ। বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে ঐশ্বর্যে এবং নতুন রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলার গুণে যে ক'টি পরিবার বিশেষ প্রাধান্য

লাভ করেছিল দত্তরা তাদের অন্যতম। তখনকার সেই নব্য-অভিজাত সমাজে দত্তরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। আমার মায়ের পিতামহ কাশীনাথ দত্ত পরিবার থেকে ভিন্ন হয়ে যান এবং কলকাতার উত্তরে প্রায় ছ'মাইল দূরে বরানগরে বিরাট এক দালান তৈরি করে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত লোক ছিলেন—দিনরাত বই নিয়েই থাকতেন। ছাত্ররা নানাভাবে তাঁর কাছে সাহায্য পেত। তিনি কলকাতার জার্ডিন, স্কিনার অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে একটি বৃটিশ সওদাগরী অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আমার মায়ের পিতা এবং পিতামহ দুজনেই তাঁদের জামাতা নির্বাচনে বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে কলকাতার বিশিষ্ট অভিজাত পরিবার ক'টির সঙ্গে এইভাবে তাঁরা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে-ছিলেন। কাশীনাথ দত্তের এক জামাতা স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় চীফ্ জাস্টিস্। আর এক জামাতা রায় বাহাদুর হরিবল্লভ বসু আইনজীবী হিসেবে উড়িষ্যায় অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি আমার পিতার বহু আগেই কটকে গিয়ে বসবাস করছিলেন।

আমার মাতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত নাকি আমার পিতাকে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করবার আগে তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা ভালো করে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন তাঁর বোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মায়ের অন্য বোনদের স্বামীদের নাম 'বরদাচন্দ্র মিত্র, সি. এস., ডিস্ট্রিক্ট ও সেসানস্ জজ্, বেনারসের উপেন্দ্রনাথ বসু, 'চন্দ্রনাথ ঘোষ, সাবর্ডিনেট জজ্ এবং কলকাতার 'রায়বাহাদুর চুণীলাল বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'ডাক্তার জে. এন্. বসু।

ইউজেনিকস-এর দিক থেকে বিচার করে দেখলে একটা জিনিস একটু অদ্ভুত ঠেকবে। বাবার দিকে আমাদের বংশে বড় পরিবার খুবই কম। মায়ের দিকে আবার এর ঠিক উল্টো। আমার মাতামহের নয় ছেলে ও ছয় মেয়ে। এদের মধ্যে ছেলেদের সন্তানসন্ততি বেশি নয়, কিন্তু মেয়েদের প্রায় সকলেরই সন্তানসংখ্যা অনেক—আমরাই তো ছিলাম আট ভাই, ছয় বোন, এখন বেঁচে আছে সাত ভাই, দু'বোন। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কারুর কারুর আটনয়টি সন্তান। অবশ্য ভাইদের চাইতে বোনদের সন্তানসংখ্যা বেশি না বোনদের চাইতে ভাইদের সন্তানসংখ্যাই বেশি তা বলা মুশকিল। এসব ক্ষেত্রে এক একটি পরিবারে সন্তানের সংখ্যা মেয়েদের দিকেই বেশি হয়, না ছেলেদের দিকে, তার জবাব হয়তো ইউজেনিস্টরাই দিতে পারবেন।

পূর্বকথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজরা ভারত দখল করবার পর দেশের সামাজিক জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল তার স্বরূপ কল্পনা করা এ যুগের লোকের পক্ষে মোটেই সহজ নয়, কিন্তু মোটামুটি তার একটি ছবি মনে না থাকলে আজকের দিনে দেশের বুকে চলচ্চিত্রের মতো যেসব পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে তার মূল সূত্রটি ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। বৃটিশ শাসনের গোড়াপত্তন বাঙলাদেশে—সুতরাং বৃটিশ শাসনে দেশের যে পরিবর্তন হয়েছে তারও শুরু বাঙলাদেশেই। দেশীয় শাসনতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত-শক্তির প্রাধান্য একেবারে কমে যায়। এদের স্থান দখল করে নতুন এক সম্প্রদায়। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে, অবস্থার পরিবর্তনে ক্রমে তাদের হাতে এলো রাজদণ্ড। কিন্তু মুষ্টিমেয় একদল ইংরেজের পক্ষে দেশীয় লোকের সহায়তা ছাড়া বাণিজ্য বা রাজ্যশাসন কোনোটাই সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় যারা দেশের ভাগ্যবিবর্তনকে মেনে নিয়ে বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার জোরে ইংরেজদের কাছে নিজেদের অপরিহার্য করে তুলেছিল তারাই সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করে-ছিল। এরাই বৃটিশ আমলের অভিজাত-সম্প্রদায়।

বৃটিশ শাসনের গোড়ার দিকে বহুদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা রাষ্টিক ও

সামাজিক কোনো ব্যাপারেই মুখ্য অংশ গ্রহণ করেনি। এর কারণ নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। একদল বলেন, বাঙলা ও অন্যান্য প্রদেশের যে শাসকদের পরাজিত করে ইংরেজরা এদেশে রাজ্য স্থাপন করেছিল তাঁরা সকলেই ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী, তাই মুসলমানেরা ইংরেজ শাসন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। আর একদল বলেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার বহু আগে থেকেই মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছিল। তাছাড়া প্রথম প্রথম আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতা সম্বন্ধে মুসলমানদের ধর্মগত আপত্তিও ছিল। এর ফলে বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে মুসলমানদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল। আমি এই দুটি মতের কোনোটাই মানতে রাজি নই, কারণ সারা ভারতে মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাতে দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের প্রাধান্য ইংরেজ আমলে বা তারও আগে কখনো কমেনি বলেই আমার ধারণা। আজকাল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের কথা প্রায়ই প্রচার করা হয় সেটা নেহাৎই কৃত্রিম, অনেকটা আয়র্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিরোধের মতো—এবং এর জন্য যে আমাদের বর্তমান শাসকেরাই বহুল পরিমাণে দায়ী সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইংরেজরা এদেশে আসবার আগে দেশের শাসনতন্ত্র মুসলমানদের হাতে ছিল বললে সম্পূর্ণটা বলা হয় না, কারণ দিল্লীর মোগল বাদশাহের সময়েই বলুন বা বাঙলার মুসলমান নবাবদের আমলেই বলুন, হিন্দু-মুসলমান পরস্পর সহযোগিতা না করলে শাসনকার্য চালানো কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। মোগল বাদশাহ এবং মুসলমান নবাবদের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মধ্যে অনেক হিন্দুও ছিল। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রসারও সম্ভব হয়েছিল হিন্দু

সেনাপতিদের সাহায্যেই। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব সিরাজদৌল্লার যে সেনাপতি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তিনি হিন্দু ছিলেন। আর ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বিদ্রোহের নেতা ছিলেন একজন মুসলমান—বাহাদুর শাহ।

যাই হোক, ইংরেজরা ভারত দখল করবার পর বাঙলাদেশে যে ক'জন মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল, যে কারণেই হোক তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। এদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) অন্যতম। ১৮২৮ সালে ইনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলাদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা দেখা দেয়। এর মূলে ছিল নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজ। এই আন্দোলন অনেকটা রেনেসাঁস ও রেফরমেশন-এর একটি সমন্বয়ের মতো। একদিকে এই আন্দোলন দেশের স্বকীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার এবং ধর্মের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল এবং অন্য দিকে, অন্যান্য দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে ভালো জিনিসটুকু গ্রহণ করতেও কম উৎসুক ছিল না। এই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন রায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৮-১৯০৫) এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তার ভার গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজই যে দেশের সব রকম প্রগতিশীল আন্দোলনের কর্ণধার ছিল সে কথা সকলেই স্বীকার করবে। প্রথম থেকেই ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিভঙ্গীতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাব পড়েছিল এবং সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সরকার যখন

স্থির করে উঠতে পারছিলেন না যে এদেশে তাঁরা সম্পূর্ণ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাই সমর্থন করবেন, না পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রচার করবেন, তখন রাজা রামমোহন রায় মুক্তকণ্ঠে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বপক্ষে রায় দেন। তাঁর আদর্শ টমাস ব্যাবিংটন মেকলেকে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছিল মেকলের বিখ্যাত 'মিনিট অন এডুকেশন'এ তার পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের আদর্শকেই সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়। রামমোহন তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বহুদিন আগেই বুঝেছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনকে গ্রহণ না করলে দেশের উন্নতি অসম্ভব।

অবশ্য এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুধু যে ব্রাহ্মসমাজেই নিবদ্ধ ছিল তা নয়। যাঁরা ব্রাহ্মদের সমাজদ্রোহী ও ধর্মবিরোধী বলে মনে করতেন তাঁরাও স্বদেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমতালে চলবার জন্য ব্রাহ্ম এবং অন্যান্য প্রগতিপন্থী সম্প্রদায় যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সার জিনিসগুলি আহরণ করতে ব্যস্ত তখন অধিকতর গোঁড়া সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুসমাজের মহিমা কীর্তন করতে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন এবং প্রচার করতে লাগলেন হিন্দুসমাজে সবই অভ্রান্ত। এমন কি তাঁরা এও দাবি করলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা যেসব নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে আজ গর্ব করছে সেসবই ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিরা বহুদিন আগেই আবিষ্কার করে গেছেন। এইভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অত্যন্ত গোঁড়া সম্প্রদায়ও কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছিলেন—শশধর তর্কচূড়ামণির নাম তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। কিন্তু এঁদের রচনার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল খৃস্টান মিশনারিদের

প্রভাব খর্ব করে হিন্দুধর্মের প্রচার করা। এ ব্যাপারে অবশ্য ব্রাহ্মদের সঙ্গে গোঁড়া পণ্ডিতদের মতৈক্য ছিল, কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কখনো মতের মিল দেখা যায়নি। পুরাতনপন্থীদের সঙ্গে নতুনের, পণ্ডিতদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের এই সংঘর্ষের ফলে আর একটি নতুন মতের উদ্ভব হয়েছিল। এই নতুন মতের প্রধান সমর্থক হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই মতের সমর্থকেরা প্রগতিপন্থী ছিলেন, এবং তাঁরা দেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের সমর্থন করতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারাকে মোটামুটি সমর্থন করলেও এঁরা কখনো হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজি হননি এবং প্রথম যুগের ব্রাহ্মদের মতো পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণকেও সমর্থন করেননি। গোঁড়া পণ্ডিতরূপে শিক্ষিত হলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তাঁর মহানুভবতা এবং সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা তো সর্বজনবিদিত। এ ছাড়া আধুনিক বাঙলা গদ্যের জনক হিসেবেও বাঙলা সাহিত্যে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এত প্রগতিপন্থী হলেও বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত জীবনে চিরকাল অত্যন্ত নিষ্ঠাবান পণ্ডিতের মতো অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে তুমুল আন্দোলন করে তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়েছিলেন—কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত। ঈশ্বরচন্দ্র যে মানসিক উদারতা ও মানবহিতৈষণার প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন ধর্মে ও দর্শনে তার প্রকাশ পেয়েছিল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৪-১৮৮৬) ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬০-১৯০২ মধ্যে। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মারা গেলে এই আধ্যাত্মিক আন্দোলনের ধারা বহন করবার ভার পড়ল অরবিন্দ ঘোষের উপর।

কিন্তু অরবিন্দ রাজনীতি এড়িয়ে চলেননি, বরং রাজনীতি নিয়ে বিশেষভাবেই মেতে উঠেছিলেন, যার ফলে ১৯০৮ সালে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অরবিন্দের মধ্যে রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। ১৯০৯ সালে অরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক চর্চায় মনোনিবেশ করেন। অরবিন্দের মধ্যে রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার যে সমন্বয় দেখা গিয়েছিল তার ধারা বহন করতে লাগলেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) এবং মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)।

বইয়ের এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকা থেকে আমার বাবা যখন কলকাতার অ্যালবার্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন সেই সময়কার সামাজিক অবস্থার মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল তখন এক নব্য অভিজাত সম্প্রদায়, বৃটিশ শাসনের আওতায় যাদের জন্ম। আজকের দিনে সোশ্যালিস্টদের ভাষায় এদের বলা চলে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিত্র'। এই নব্য অভিজাত সম্প্রদায় তিনভাগে বিভক্ত ছিল—(১) জমিদার, (২) আইনজীবী এবং সিভিল সার্ভেণ্ট, (৩) ধনী ব্যবসায়ী। বৃটিশ শাসকেরা তাদের শাসন ও শোষণ নীতি অবাধে চালাবার জন্যই এদের সৃষ্টি করেছিল।

বৃটিশ শাসনে যে জমিদার সম্প্রদায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল তাদের স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন সামন্তরাজাদের পর্যায়ে ফেলা চলে না, কারণ একমাত্র রাজস্ব আদায় করা ছাড়া এদের কোনো কাজই ছিল না— বৃটিশ সরকারও এদের ট্যাক্স-কালেক্টরের বেশি মর্যাদা কখনো দেয়নি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে যখন ইংরেজদের পতন প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে এরা রাজভক্তির যে পরাকাষ্ঠা

দেখিয়েছিল তারই প্রতিদানে বৃটিশ সরকার এদের জমিদার পদমর্যাদা দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল।

বিদেশী শাসকের গড়া এই নব্য অভিজাত সম্প্রদায় যে তখনকার সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর প্রমুখ লোকদের সরকারপক্ষ সমাজের নেতা বলে গ্রহণও করেছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের উপর এদের নৈতিক বা সাংস্কৃতিক কোনো প্রভাবই ছিল না। আমার পিতার যৌবনকালে এই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং কিছু পরিমাণে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কেশবচন্দ্রের শিষ্য ছিল অগণন, তিনি যেখানেই যেতেন বিরাট জনতা তাঁকে ঘিরে থাকত। তাঁর বক্তৃতার আধ্যাত্মিক ভাবধারা সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষত যুব-সম্প্রদায়ের উপর তার প্রভাব ছিল অপরিমেয়। অন্যান্য ছাত্রদের মতো আমার পিতাও কেশবচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, এমন কি এক সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার উদ্যোগও করেছিলেন। যাই হোক, আমার পিতার জীবনে কেশবচন্দ্রের প্রভাব যে খুব বেশি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর বহুদিন পরে কটকপ্রবাসের সময়ে এই মহাপুরুষের অনেক ছবি আমাদের বাড়ির দেয়ালে টাঙানো দেখেছি। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও আমার পিতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

আমার পিতার প্রথম বয়সে দেশে এক ধরনের নৈতিক জাগরণ দেখা গিয়েছিল সত্যি, কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে তখন পর্যন্ত দেশের লোকের মধ্যে কোনো সাড়াই জাগেনি। কেশবচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র—সমাজ-সংস্কারক হিসেবে দুজনেই বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন, কিন্তু এঁরা

কেউই বৃটিশ সরকারের বিরোধী ছিলেন না। বরং কেশবচন্দ্র খোলাখুলিভাবেই বলতেন যে বৃটিশ শাসন এদেশে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ। স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক হলেও ঈশ্বরচন্দ্রও কখনো সরকার বা ইংরেজ জাতির সঙ্গে বিরোধিতা করেননি। আমার পিতাও প্রখর নীতিজ্ঞানসম্পন্ন হলেও সরকার-বিরোধী ছিলেন না। এবং এজন্যই তিনি সরকারপক্ষের উকিল ও পাব্লিক প্রোসিকিউটরের পদ এবং সরকারী খেতাব গ্রহণ করেছিলেন। আমার জ্যেঠামশাই অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ বসুর প্রকৃতি ঠিক বাবার মতোই ছিল। তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং অসাধারণ মনীষার জন্য ছাত্ররা তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করত। তিনিও শিক্ষা-বিভাগে সরকারী চাকরি করতেন। একই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) পক্ষে “বন্দে মাতরম্” গানটি রচনা করেও সরকারী চাকরি করা সম্ভব ছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও ডি. এল. রায়ের পক্ষে স্বদেশী গান রচনা করা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। যে যুগসন্ধিক্ষণে এ ধরনের মনোভাব সম্ভবপর ছিল সে সময়ে দেশের লোকেদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছিল না বললেই চলে। ১৯০৫ সালে জনমতের বিরুদ্ধে বঙ্গবিভাগ হবার পর থেকেই দেশে রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা দেয় এবং তখন থেকেই সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের বিরোধের সূত্রপাত। আজকের দিনে সরকার সম্বন্ধে জনসাধারণ অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং সরকারও জনসাধারণের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ। এখন আর ন্যায়-অন্যায় বোধকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখা চলে না—এবং ন্যায়ের পথ ধরলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতার ধারা খণ্ডিতভাবে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনেই প্রতিফলিত হয়—আমার জীবনেও তার

ব্যতিক্রম হয়নি। আমি এককালে ভাবতাম সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি এড়িয়েও নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব। কিন্তু আমার ভুল ভাঙতে বেশি দেরি হয়নি। জীবনকে এভাবে রাজনীতির প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে জীবনের অনেকখানিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়—খণ্ডিত আদর্শের কোনো মূল্যই নেই, কোনো একটি আদর্শকে সফল করে তুলতে হলে সমগ্র জীবন দিয়ে তাকে মানতে হবে। অন্ধকার ঘরে যদি একটি আলো রাখা যায় তবে সমস্ত ঘরটাই কি আলোকিত হয়ে উঠবে না!

স্কুল জীবন (১)

তখন ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাস। আমার পাঁচ বছর পূর্ণ হতে তখনো কিছু বাকি, এমনি সময়ে একদিন শুনলাম আমি নাকি স্কুলে ভর্তি হব। খবর পেয়ে আমি তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। দিনের পর দিন চোখের উপর দেখতাম দাদা দিদিরা সেজেগুজে স্কুলে যেত—ছোটো বলে আমিই শুধু বাড়িতে পড়ে থাকতাম—এতে মেজাজ বিগড়ে যেত। কাজেই স্কুলে যাবার নামে আমি নেচে উঠলাম।

যেদিন প্রথম স্কুলে যাবার কথা সেদিনটির কথা আজও আমার মনে আছে। শেষটায় আমিও বড়দের মতো স্কুলে যেতে পারবো, শুধু ছুটির দিন ছাড়া বাড়িতে থাকবো না! স্কুল বসত ঠিক দশটায়, কাজেই দশটার একটু আগেই আমাদের রওনা হতে হবে। আমারই বয়সী আমার দুজন কাকারও সেদিন ভর্তি হবার কথা ছিল। সবাই প্রস্তুত হয়ে নিয়ে গাড়িতে ওঠবার জন্য মাত্র ছুট্ লাগিয়েছি, এমন সময়ে পা পিছলে এক বিশ্রী রকম আছাড় খেলাম। মাথায় চোট লেগেছিল, কাজেই ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে সেদিনকার মতো আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হল। আমার কাকাদের ভাগ্য ছিল ভালো, ওরা দিব্যি স্কুলে চলে গেল, আর আমি ভগ্নহৃদয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলাম।

পরের দিন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

আমাদের স্কুলটা ছিল মিশনারিদের, আর এখানকার বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই ছিল য়ুরোপীয় কিংবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ভারতীয়দের জন্য গোনাগুনতি কয়েকটা (শতকরা বোধ হয় ১৫টা) সীট ছিল। আমার অন্য ভাইবোনেরাও এই স্কুলেই পড়ত, কাজেই আমিও এখানে ভরতি হলাম। বেছে বেছে এই স্কুলেই আমাদের কেন ভরতি করা হয়েছিল জানিনে, হয়তো অন্য সব স্কুলের চাইতে এখানে ইংরিজিটা তাড়াতাড়ি এবং ভালো শেখা যেত বলেই—আর তখনকার দিনে ইংরিজিজ্ঞানের বিশেষ কদরও ছিল। এখনো মনে আছে ভরতি হবার সময়ে আমার ইংরিজি বিদ্যের দৌড় বর্ণপরিচয়ের বেশি ছিল না। একটাও ইংরিজি কথা না জেনেও আমি কি করে যে চালিয়ে নিতাম এখন ভাবলে আশ্চর্য মনে হয়। প্রথম প্রথম ইংরিজি বলতে গিয়ে যে কি বিভ্রাট হত ভাবলে হাসি পায়। একটা ঘটনা মনে পড়ে। একবার আমাদের সকলের হাতে একটি করে স্লেট পেনসিল দিয়ে আমাদের শিক্ষয়িত্রী বলেছেন সেগুলোকে ছুঁচোলো করে নিতে। আমি দেখলাম কাকার চাইতে আমার পেনসিলটা বেশি ছুঁচোলো হয়েছে—অমনি ইংরিজিতে শিক্ষয়িত্রীকে সেটা জানিয়ে দেবার জন্য বললাম—"রনেন্দ্র মোট, আই শোর" বলেই মনে মনে নিজের ইংরিজি-জ্ঞানের তারিফ না করে পারলাম না।

আমাদের মাস্টারদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—তার মধ্যে আবার শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশি। শুধু প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্টার এবং মিসেস্ ইয়াং ইংলণ্ড থেকে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজনকেই আমরা পছন্দ করতাম। মিস্টার ইয়াংকে আমরা ভক্তি করতাম ঠিকই, কিন্তু ভয়ও করতাম সাংঘাতিক, কারণ তিনি বেতটা একটু বেশিই ব্যবহার করতেন। মিস্

ক্যাডোগানকে আমরা কোনোরকমে বরদাস্ত করতাম। আর, মিস্‌ স্যামুয়েলকে তো আমরা দস্তুরমতো ঘৃণা করতাম—কোনোদিন যদি তিনি অনুপস্থিত থাকতেন আমাদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে যেত। মিসেস্‌ ইয়াংকে অবশ্য আমরা অপছন্দ করতাম না। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগত মিস্‌ সারা লরেন্স-কে, তিনি ছিলেন আমাদের প্রথম শিক্ষয়িত্রী! এমন আশ্চর্য সহানুভূতিশীল ছিল তাঁর মন এবং শিশুমন তিনি এমন অন্তরঙ্গভাবে বুঝতেন যে আমরা সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারিনি। গোড়ার দিকে যখন আমি এক বর্ণও ইংরিজি বলতে পারতাম না তখন তাঁর সাহায্য না পেলে আমি অত সহজে ক্লাসের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারতাম কি না সন্দেহ।

অধিকাংশ শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রছাত্রী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলেও আমাদের স্কুলটা ছিল বিলিতী ছাঁচে গড়া এবং যতদূর সম্ভব বিলিতী-ভাবাপন্ন। এর ফলে এমন কয়েকটা জিনিস আমরা শিখেছিলাম যা সাধারণ দেশী স্কুলে পড়লে শিখতে পারতাম না। দেশী স্কুলে যেমনটি দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীদের ষোলোআনা মনোযোগই বরাদ্দ হয় পড়ার উপরে, এখানে মোটেই তা ছিল না। পড়ার চাইতে বেশি মনোযোগ দেওয়া হত ভদ্র আচরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সময়ানুবর্তিতার উপরে—দেশী স্কুলে যার একান্ত অভাব। পড়াশোনার ব্যাপারেও প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া হত, রোজকার পড়া নিয়মিতভাবে শেখানো হত—দেশী স্কুলে যেটা খুব কমই হয়। রোজকার পড়া এইভাবে হয়ে যাওয়ার ফলে পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়বার কোনো দরকারই হত না। তাছাড়া এখানে দেশী স্কুলের চাইতে অনেক ভালো ইংরিজি শেখানো হত।

কিন্তু এত সব সুবিধে সত্ত্বেও ভারতীয় ছেলেদের পক্ষে এরকম স্কুলে

পড়া ভালো কি না বলা মুশকিল। এই জাতীয় স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হলেও, যে শিক্ষা এখানে দেওয়া হত ভারতীয়দের দিক থেকে তার উপযোগিতা বিশেষ ছিল না। বাইবেল-এর উপরে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত এবং বাইবেল পড়াবার ধরনও ছিল অত্যন্ত নীরস। বুঝি বা না বুঝি পুরুতদের মন্ত্রপাঠের মতো আমাদের বাইবেল মুখস্ত করতে হত। সাত বছর ধরে দিবারাত্র এইভাবে বাইবেল পড়লেও বাইবেলের রস প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম আরো অনেক বছর পরে, যখন আমি কলেজে পড়ি।

আমাদের পাঠ্যতালিকা এমনভাবে তৈরি হত যাতে মনেপ্রাণে আমরা ইংরেজ হয়ে উঠতে পারি। গ্রেটব্রিটেনের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে আমার যতখানি জ্ঞান ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে তার সিকিভাগও ছিল কি না সন্দেহ। ভারতীয় নামও আমরা উচ্চারণ করতাম বিদেশীদের মতো বিকৃতভাবে। ল্যাটিন শব্দরূপ মুখস্ত করতে করতে আমরা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠতাম, অথচ পি. ই. স্কুল ছাড়বার আগে সংস্কৃত ধাতুরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। গানের ক্লাসে আমরা শিখতাম ডো রে মি ফা; সা রে গা মা নয়। পাঠ্য বইয়ে পড়তাম ওদেশের ইতিহাসের গল্প, রূপকথা—নিজের দেশের ছিটে-ফোঁটাও তাতে থাকত না। বলাই বাহুল্য দেশী কোনো ভাষাই সেখানে শেখানো হত না, আমরাও দেশী স্কুলে ঢোকবার আগে পর্যন্ত মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েই বেরিয়েছি। অবশ্য এসব কারণে যে আমাদের স্কুলজীবন নিরানন্দে কেটেছে তা নয়। বরং উল্টোটাই হয়েছে। প্রথম কয়েক বছর তো এখানকার শিক্ষা আমাদের উপযোগী কি না সে সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন ছিলাম না। যা আমাদের শেখানো হত সাগ্রহে তাই শিখতাম এবং স্কুলের আবহাওয়ার সঙ্গে

নিজেদের সম্পূর্ণ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের স্কুলের ছেলে-মেয়েদের অত্যন্ত ভদ্র বলে বাইরে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল—আমরা সেই খ্যাতি কখনো ক্ষুণ্ণ হতে দিইনি। আমাদের বাপমাও আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমাদের পরিবার সম্পর্কে স্কুলকর্তৃপক্ষের ধারণা খুব ভালো ছিল, কারণ আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা প্রায় সকলেই নিজের নিজের ক্লাসে বরাবর সর্বোচ্চ স্থান দখল করে এসেছে।

খেলাধুলার ব্যাপারে এখানে যথেষ্ট যত্ন নিলেও বিলিতী আদর্শে পরিচালিত স্কুলে যতটা নেওয়া উচিত ঠিক ততটা নেওয়া হত না। আমাদের প্রধান শিক্ষকমশাই নিজে খেলাধুলায় তত উৎসাহী ছিলেন না বলেই বোধ হয় এদিকে তাঁর দৃষ্টি বিশেষ প্রখর ছিল না। প্রধান শিক্ষকমশাই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন এবং তাঁর প্রভাব স্কুলের সর্বত্র টের পাওয়া যেত। নিয়মানুবর্তিতা ও ভদ্র আচরণকে তিনি শিক্ষার সবচেয়ে বড় অঙ্গ বলে মানতেন। আমাদের প্রগ্রেস রিপোর্টে শুধু পাঠ্য বিষয়েই নম্বর দেওয়া হত না, (১) স্বভাব, (২) আচরণ, (৩) পরিচ্ছন্নতা, (৪) সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদিতেও নম্বর ছিল। এর ফলে স্কুলের ছেলেমেয়েরা সকলেই খুব ভদ্র ছিল। দুষ্টুমি করলে বা স্কুলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে ছেলেদের বেত মেরে সাজা দেওয়া হত, তবে স্কুলের মধ্যে মাত্র দুজনেরই বেত মারার ক্ষমতা ছিল—একজন আমাদের প্রধান শিক্ষকমশাই আর একজন তাঁরই সুযোগ্য পত্নী মিসেস্ ইয়াং।

মিস্টার ইয়াং-এর অনেকগুলি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আমরা যথেষ্ট হাসাহাসি করতাম। ইয়াং-এর বড় এক ভাই

ছিলেন অবিবাহিত মিশনারি। মিশনারিসুলভ শ্মশ্রুবহুল এই ভদ্রলোক ছোটো ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং প্রায়ই তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে যেতেন। এঁর নাম দিয়েছিলাম আমরা 'ওল্ড ইয়াং' আর আমাদের প্রধান শিক্ষককে বলতাম 'ইয়াং ইয়াং'। মিস্টার ইয়াং প্রায়ই সর্দিতে ভুগতেন, তাই গরমের দিনেও তিনি বৃষ্টি পড়লেই দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকতেন, পাছে ঠাণ্ডা লাগে। সর্দির কুফল সম্বন্ধে প্রায়ই তিনি নানাভাবে আমাদের সাবধান করতেন, বলতেন, সর্দি থেকে কলেরা পর্যন্ত হতে পারে। কখনো অসুস্থ বোধ করলে তিনি এমন কুইনিন খেতেন যে কিছুদিন প্রায় কালা হয়ে থাকতেন। এদেশে দীর্ঘ কুড়ি বছর বাস করবার পরও তিনি স্থানীয় ভাষায় একটি কথাও শুদ্ধ করে বলতে পারতেন কি না সন্দেহ। স্কুলের বাইরে তিনি বেড়াবার জন্যও কখনো বেরোতেন না। যদি চাপরাশি তাঁর টেবিলে কিছু রাখতে ভুলে যেত মিস্টার ইয়াং ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে ডাকতেন, তারপর যে জিনিসটা দরকার ইশারায় বুঝিয়ে দিয়ে, তার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, দেশীয় ভাষায় তাকে বকুনি দিতে না পারায় বিড়বিড় করে ইংরিজিতেই বলতেন, "এ কাজটা আগে কেন করা হয়নি?" কেউ তাঁর কাছে চিঠি নিয়ে এলে তাকে যদি অপেক্ষা করতে বলার দরকার হত তবে মিস্টার ইয়াং ছুটে গিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে অপেক্ষা করতে বলার দেশীয় ভাষাটা জেনে নিয়ে সেটাকে আওড়াতে আওড়াতে এসে কোনো রকমে বলে ফেলে ভারমুক্ত হতেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের প্রধান শিক্ষক মশাইয়ের চালচলন ছিল অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন এবং তাঁকে আমরা সকলে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। অবশ্য এই শ্রদ্ধার সঙ্গে বেশ খানিকটা ভয়ও থাকতো। আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রীও অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিলেন, কাজেই আমরা সকলেই তাঁকে

ভালোবাসতাম। আমাদের সামা   রীতিনীতি বা ধর্মবিশ্বাসে এ'রা কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না।

এইভাবে কয়েক বছর আমাদের বেশ স্বচ্ছন্দেই কেটে গিয়েছিল—স্কুলের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের আমরা বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ক্রমেই যেন ছন্দপতন ঘটতে লাগল। কোথায় কি যে ঘটল, যার ফলে এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা ক্রমেই আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। স্থানীয় কোনো ঘটনাই এর কারণ, না দেশের নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনারই এটা একটা ঢেউ, সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখাই ভালো।

নানা কারণে এই রাজনৈতিক জাগরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তার ফলে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল তার জন্য আমরা ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। এতদিন পর্যন্ত আমরা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করছিলাম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে লাগলাম এই দুটি জগতের মধ্যে একটা বড় অসংগতি রয়ে গেছে। পরিবার ও সামাজিক জীবন নিয়ে একটি জগৎ, যেটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। আর, স্কুল, যেটা সম্পূর্ণ বিলিতীভাবাপন্ন না হলেও তার কাছাকাছি যেত—আর একটি জগৎ। আমরা জানতাম আমরা ভারতীয় বলে প্রাইমারি ও মিড্‌ল স্কুল পরীক্ষা দিতে পারলেও স্কলারশিপ পরীক্ষা দেবার অধিকার আমাদের নেই—যদিও বাৎসরিক পরীক্ষাগুলিতে আমরাই সাধারণত সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতাম। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেরা ভলাণ্টিয়ার কোর-এ যোগ দিতে পারত, বন্দুক ব্যবহার করতে পারত, কিন্তু আমাদের এসব অধিকার ছিল না। এইসব ছোটোখাটো ব্যাপার থেকেই আমাদের চোখ খুলে গেল, বুঝলাম এক স্কুলে পড়লেও আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের ভিন্ন চোখে দেখা হয়। ইংরেজ বা

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের সঙ্গে ভারতীয় ছেলেদের প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হত—যার পরিসমাপ্তি ঘটত বক্সিং-এ। এইসব বক্সিং-প্রতিযোগিতায় ভারতীয় এবং অভারতীয়দের পরিষ্কার দুটো দল খাড়া হয়ে যেত। উচ্চপদস্থ একজন ভারতীয় অফিসারের এক ছেলে আমাদের সহপাঠী ছিল—সে প্রায়ই ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় ছেলেদের মধ্যে ম্যাচখেলার আয়োজন করত—খেলোয়াড়মাত্রেই এইসব প্রতিযোগিতায় যোগ দিত। মনে পড়ে নিজেদের মধ্যে আমরা প্রায়ই বলাবলি করতাম, বাইবেল আর পড়ব না, আর নিজেদের ধর্মও কিছুতেই ছাড়বো না। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠ্যতালিকা চালু হল। এই তালিকা অনুযায়ী প্রবেশিকা, ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষায় বাঙলা অবশ্য পাঠ্য বলে নির্দিষ্ট হল। এ ছাড়া প্রবেশিকা পাঠ্যতালিকায় আরো অনেকগুলি পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমরা দেখলাম পি. ই. স্কুলের পাঠ্যতালিকা ভারতীয় ছেলেদের মোটেই উপযোগী নয়, কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্য কোনো দেশী স্কুলে ভরতি হলে আমাদের একেবারে গোড়ার থেকে বাঙলা ও সংস্কৃত শিখতে হবে। আমার দাদারা সকলেই প্রবেশিকা, ইণ্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল—এবং তারা যে জগতে চলাফেরা করত তার গল্প শুনে আমার মনও বিচলিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তাই বলে স্কুল সম্বন্ধে কখনো আমার মনে বিরুদ্ধ ভাব জাগেনি। ১৯০২ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সাত বছর আমি এই স্কুলে কাটিয়েছি কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি কোনো কারণে অসুখী হইনি। যেসব অসংগতির কথা উল্লেখ করেছি সেসব আমরা বিশেষ গায়ে মাখতাম না, ফলে আমাদের স্কুলজীবনের স্বচ্ছন্দ ধারা কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। শুধু শেষের দিকে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের ভাব মনে মনে

অনুভব করেছি এবং এই পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছি। স্বদেশী আদর্শে গড়া কোনো স্কুলে পড়বার জন্য তখন থেকেই আমার মনে আগ্রহ জেগে উঠেছিল। ভাবতাম ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারব। কিন্তু ১৯০৯ সালে জানুয়ারি মাসে স্কুল ছাড়বার সময়ে যখন আমি ছাত্র ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর প্রধান শিক্ষক মশাইয়ের কাছে বিদায় নিতে গেলাম তখন আমার মনে বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধভাবও ছিল না। তখনকার মনোভাব বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা সে সময়ে আমার ছিল না। আজ অভিজ্ঞ মন নিয়ে বিচার করে এই মনোভাবের অনেকগুলি কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পড়াশোনায় আমি বরাবরই ভালো ফল করে এসেছি, কিন্তু খেলাধুলায় নেহাতই আনাড়ী ছিলাম। অথচ আমাদের স্কুলে পড়াশোনার চাইতে খেলার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হত, তাই নিজের সম্বন্ধে আমার বরাবরই খুব নিচু ধারণা ছিল। এই ধারণা বহু চেষ্টা করেও মন থেকে সরাতে পারিনি। একেবারে নিচু ক্লাসে ভরতি হয়েছিলাম বলেই বোধ হয় বড়দের তুলনায় নিজেকে তুচ্ছ মনে করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সব দিক বিচার করে আজকের দিনে এই ধরনের স্কুলে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের আমি পক্ষপাতী নই। বিদেশী আবহাওয়ার সঙ্গে তারা কখনোই খাপ খাবে না, পদে পদে অশান্তি ভোগ করবে; বিশেষ করে যদি কেউ একটু চিন্তাশীল হয় তবে তো কথাই নেই। অনেক অভিজাত পরিবারে ছেলেদের বিলেতে পাব্‌লিক স্কুলে রেখে শিক্ষা দেবার রীতি আজও চলে আসছে। এ ব্যবস্থাও আমার মোটেই ভালো মনে হয় না। একই কারণে বিলিতী ছাঁচে গড়া

এবং ইংরেজ শিক্ষক পরিচালিত ভারতীয় স্কুলের পরিকল্পনাও আমি অনুমোদন করি না। অনেক ছেলে হয়তো এই বিজাতীয় পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের বেশ মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু যারা একটু চিন্তাশীল তাদের পক্ষে এখানকার পরিবেশ মোটেই অনুকূল নয়, একদিন না একদিন তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠবেই। এসব কথা ছেড়ে দিলেও এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরো বড় আপত্তি এই যে এতে ভারতীয় পরিবেশ, ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সমাজনীতিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হত। অল্পবয়সের ছেলেদের উপর জোর করে ইংরিজি শিক্ষা চাপালেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় হয় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভালোমন্দ বিচার করবার জ্ঞান হলে পর ছেলেদের পাশ্চাত্য দেশে খাঁটি পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় কিছুদিন রাখলে তবে তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালো জিনিসটুকু গ্রহণ করতে পারবে।

স্কুল জীবন (২)

নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্যে আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবে, তার উপর কতখানি নির্ভর করে, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমি যখন কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে ভরতি হলাম আমার মনের একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটল। য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের কাছে আমার বংশমর্যাদার কোনো মূল্য ছিল না, কিন্তু ভারতীয় ছেলেদের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটাই দেখা গেল। তাছাড়া অন্য সকলের চাইতে আমার ইংরিজি জ্ঞান বেশি থাকার দরুন সকলেই আমাকে অত্যন্ত সমীহ করে চলত। এমন কি শিক্ষকেরা পর্যন্ত আমার পক্ষপাতিত্ব করতেন, কারণ তাঁরা সকলেই ধরে নিয়েছিলেন আমি ক্লাসে প্রথম হব—আর ভারতীয় স্কুলে লেখাপড়াই হল ভালোমন্দর মাপকাঠি। প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় আমি সত্যিই প্রথম হলাম। নতুন এই পরিবেশে এসে প্রথম অনুভব করলাম আমি নেহাত নগণ্য নই। এই মনোভাবকে অহঙ্কার না বলে আত্মপ্রত্যয় বললেই ঠিক বলা হবে। এতদিন পর্যন্ত আমার মধ্যে এই আত্মপ্রত্যয়েরই অভাব ছিল—যে আত্মপ্রত্যয়ের জোরে মানুষ জীবনে সফলতা লাভ করে।

এবার আমাকে আর ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে ভরতি হতে হল না, আমি ভরতি

হলাম গিয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে—কাজেই বড় ছেলেদের হিংসে করবার আর কোনো কারণ রইল না। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেদের উঁচু ক্লাসের ছাত্র বলেই মনে করত এবং বেশ একটা ভারিক্কী চালে চলাফেরা করত। আমিও তাদের দলেই ছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে একেবারে কাবু করে রেখেছিল। এই স্কুলে ভর্তি হবার আগে আমি বাঙলা এক বর্ণও পড়িনি। এদিকে আমার সহপাঠীরা সকলেই বাঙলায় বেশ পাকা ছিল। মনে পড়ে প্রথম দিন আমি 'গরু' (না ঘোড়া?) সম্বন্ধে বাঙলায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, আর সেই রচনা নিয়ে ক্লাসে সে কি হাসাহাসি! ব্যাকরণ বা বানান সব কিছুতেই আমি দিগ্‌গজ ছিলাম। শিক্ষকমশাই যখন টীকাটিপ্পনি সহকারে ক্লাসের সকলকে আমার অপূর্ব রচনাখানি পড়ে শোনালেন তখন চারদিকে এমন হাসির ধুম পড়ে গেল যে লজ্জায় আমি প্রায় মাটিতে মিশে গেলাম। পড়াশোনার জন্য এভাবে আগে কখনো আমাকে বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়নি, তার উপরে আমার আত্মসম্মানজ্ঞানও হালে একটু বেড়েছিল, কাজেই আমার অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছিল সহজেই বুঝতে পারবেন। এর পর বহুদিন পর্যন্ত বাঙলা ক্লাসের নামেই আমার জ্বর আসত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাগে দুঃখে জ্বলে গেলেও প্রথম প্রথম টিট্‌কিরি সহ্য না করে উপায় ছিল না। মনে মনে তখন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বাঙলা আমি শিখবই। ধীরে ধীরে বাঙলায় বেশ উন্নতি করতে লাগলাম এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় যখন বাঙলায় আমিই সবচেয়ে বেশি নম্বর পেলাম তখন আমার আনন্দ দেখে কে?

এই নতুন পরিবেশে আমার দিন খুব আনন্দেই কাটছিল। আগের স্কুলে সাত বছর কাটালেও সেখানে আমার বন্ধু বলতে কেউ ছিল না। কিন্তু এখানে এসে অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু জুটে গেল। আমার বন্ধুরাও

আমার মতোই খেলাধুলা বিশেষ পছন্দ করত না। অবশ্য ড্রিলটা আমার মন্দ লাগত না। আমার নিজের উৎসাহের অভাব ছাড়াও আরো একটা কারণে খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ছেলেরা সাধারণত স্কুল ছুটির পর বাড়ি গিয়ে জলখাবার খেয়ে খেলার মাঠে আসত। আমার বাবা মা এটা পছন্দ করতেন না। হয়তো তাঁরা ভাবতেন খেলাধুলা নিয়ে বেশি মাতলে পড়ার ক্ষতি হবে, নয়তো তাঁদের ধারণা ছিল খেলার মাঠের আবহাওয়াটা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। সম্ভবত শেষেরটাই প্রকৃত কারণ। যাই হোক, কখনো খেলবার ইচ্ছে হলে বাড়িতে না জানিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আমার ভাই ও কাকাদের মধ্যে অনেকে প্রায়ই এভাবে লুকিয়ে খেলতে যেত। ধরা পড়লে একচোট বকুনি জুটত কপালে। কিন্তু বাবা মা প্রায় রোজই বিকেলে বেড়াতে বেরোতেন, কাজেই তাঁদের চোখে ধুলো দেওয়া কঠিন ছিল না। আমার নিজের যদি তেমন ইচ্ছে থাকত তবে কি আর খেলতে পারতাম না! কিন্তু নিজেরই আমার চাড় ছিল না।

তাছাড়া আমি আবার একটু সুবোধ-সুশীল গোছের ছিলাম—প্রাণপণে সংস্কৃত নীতিকথা মুখস্থ করতাম। এইসব নীতিকথাতেই পেয়েছিলাম—'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ, পিতা হি পরমন্তপঃ', জেনেছিলাম পিতার চেয়ে মাতা আরো বড়। এই জাতীয় সব নীতিকথা পড়ে আমি বাপমায়ের একান্ত বাধ্য হয়ে উঠেছিলাম।

খেলাধুলা ছেড়ে আমারই মতো কয়েকটি সুবোধ-সুশীল ছেলেকে নিয়ে বাগান করায় মন দিয়েছিলাম। আমাদের বাড়িতে তরিতরকারি ও ফুলের বেশ বড় বাগান ছিল। মালীদের সঙ্গে আমরাও গাছে জল দিতাম, মাটি খুঁড়তাম, চষতাম। আমার খুব ভালো লাগত। বাগান করতে করতেই আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে

উঠেছিলাম। আমরা নিয়মিত ব্যায়ামও করতাম। বাড়ির ভিতরেই তার সব ব্যবস্থা ছিল।

অতীতের দিকে তাকিয়ে এখন ভাবি ছেলেবেলায় খেলাধুলো না করে কী ভুলটাই করেছি। মন আমার অকালেই পেকে গিয়েছিল, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। গাছপালাই হোক আর মানুষই হোক অকালে পেকে ওঠা কারুর পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়, এর কুফল একদিন না একদিন ভুগতেই হবে। ক্রমবৃদ্ধিই প্রকৃতির নিয়ম এবং তার ব্যতিক্রম হলে ফল কখনো ভালো হয় না, এজন্যই অল্পবয়সে যাদের অস্বাভাবিক প্রতিভা দেখা যায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিভার আর কোনো চিহ্নই থাকে না।

বছর দুয়েক এইভাবেই কেটে গেল। শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে বাঙালী, উড়িয়া দুইই ছিল, এবং পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। তখনকার দিনে প্রতিবেশী এই দুটি প্রদেশের মধ্যে কোনোরকম বিবাদ-বিসম্বাদের কথা শোনা যেত না, অন্তত আমরা তো কখনো শুনিনি। আমাদের পরিবারের কারুর মধ্যেই এ ধরনের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার ভাব ছিল না। এজন্য বাপমায়ের কাছে আমরা ঋণী। উড়িয়াদের সঙ্গে বাবার যথেষ্ট মেলামেশা ছিল এবং অনেক বিশিষ্ট উড়িয়া পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এর ফলে স্বভাবতই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত উদার ও সহানুভূতিশীল এবং তার প্রভাবে পরিবারের অন্য সকলের মনও একই ছাঁচে গড়ে উঠেছিল। উড়িয়াদের সম্বন্ধে, শুধু উড়িয়া কেন অন্য যে কোনো প্রদেশের লোক সম্বন্ধেই, বাবার মুখে কখনো কোনো কটুকথা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। বাবার স্বভাব ছিল একটু চাপা ধরনের, সহজে কোনো উচ্ছ্বাস তার মধ্যে প্রকাশ পেত না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সংস্পর্শে যেই এসেছে

তাঁকে ভালো না বেসে পারেনি। বাপমায়ের প্রভাব ছেলেমেয়েদের উপরে অলক্ষিতে কতখানি কাজ করে সেটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়লে ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে।

শিক্ষকদের মধ্যে একজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি হলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স বারোর কিছু বেশি হবে। এর আগে আর কাউকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেছি বলে মনে পড়ে না। বেণীমাধব দাসকে দেখবার পর শ্রদ্ধা কাকে বলে মনেপ্রাণে অনুভব করলাম। কেন যে তাঁকে দেখলে মনে শ্রদ্ধা জাগত তা বোঝবার মতো বয়স তখনো আমার হয়নি। শুধু বুঝতে পারতাম তিনি সাধারণ শিক্ষকের পর্যায়ে পড়েন না। মনে মনে ভাবতাম, মানুষের মতো মানুষ হতে হলে ওঁর আদর্শেই নিজেকে গড়তে হবে। আদর্শের কথা বলতে গিয়ে পি. ই. স্কুলের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমার বয়স তখন বছর দশেক হবে। বড়ো হয়ে আমরা কে কী হতে চাই সে সম্বন্ধে শিক্ষকমশাই আমাদের প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছিলেন। আমার বড়দাকে জজ্, ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, কার পদমর্যাদা কতখানি সে সম্বন্ধে প্রায়ই বলতে শুনতাম। শুনে শুনে এ সম্পর্কে আমার যা ধারণা জন্মেছিল তাই দিয়ে কোনোরকমে এক প্রবন্ধ খাড়া করলাম, তাতে বোধ হয় আমি কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেট দুই-ই হতে চেয়েছিলাম। প্রবন্ধটি পড়ে শিক্ষকমশাই আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে বললেন প্রথমে কমিশনার হয়ে তারপর ম্যাজিস্ট্রেট হতে চাইলে লোকে পাগল বলবে। আমার বয়স তখন খুবই কম, কাজেই কোন পেশার কতখানি মর্যাদা কিছুই বুঝতাম

না। তবে বাড়িতে সবাই যা বলাবলি করত তা থেকে বুঝেছিলাম আই. সি. এস্. এর মতো চাকরি আর হয় না।

প্রধান শিক্ষকমশাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নিচে কোনো ক্লাস নিতেন না, তাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে কবে তাঁর কাছে পড়তে পারবো সেই শুভদিনের অপেক্ষায় অধীরভাবে দিন কাটাতাম। অবশেষে সেইদিন এল, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাঁর কাছে বেশিদিন পড়া ছিল না, কারণ কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি বদলি হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন। কিন্তু অল্পদিনের জন্য পড়ালেও যাবার আগে তিনি আমার মনে মোটামুটি একটা নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে দিয়ে গেলেন—বুঝতে শিখলাম জীবনে নৈতিক আদর্শটাই সবচেয়ে বড়ো জিনিস। পাঠ্য বইয়ে পড়েছিলাম—

> পদমর্যাদা—মোহরের পিঠে ছাপ তো শুধু,
> আসল সোনা সে আর কেউ নয়, মানুষ নিজে।

এর মর্ম তিনিই আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এতে আমার চরিত্রগঠনে কতখানি যে সাহায্য হয়েছিল বলবার নয়—কারণ তখন আমার মধ্যে যৌনচেতনার প্রথম উন্মেষ দেখা দিয়েছে—বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেটা স্বাভাবিকভাবে সকলের মধ্যেই আসে।

প্রধান শিক্ষকমশাই তাঁর অনুগত ও গুণমুগ্ধ ছাত্রদের কাছ থেকে যখন বিদায় নিলেন সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। যখন ক্লাসে ঢুকলেন, পরিষ্কার দেখা গেল তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আন্তরিক আবেগে তিনি বলতে শুরু করলেন, "বেশি আমার কিছু বলবার নেই, শুধু প্রার্থনা করি ভগবান তোমাদের মঙ্গল

করুন...” এর পর আর কোনো কথা আমার কানে যায়নি। কান্নায় আমার ভেতরটা গুমরে উঠছিল, চোখের জল যেন আর বাগ মানতে চায় না। কিন্তু চারদিকে অত ছেলে, কাঁদলে সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে, তাই অনেক কষ্টে কান্না চেপে গেলাম। ক্লাস ছুটি হয়ে গেলে, ছেলেরা দলে দলে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমিও বেরোলাম। প্রধান শিক্ষকমশাইয়ের ঘরের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি দেখলাম তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ক্ষণেকের জন্য দুজনের চোখাচোখি হল। ক্লাসে এতক্ষণ কোনোরকমে কান্না চেপে ছিলাম, এবার আর পারলাম না, চোখে জল এসে গেল। তিনি নেমে এসে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, বললেন আবার আমাদের দেখা হবে। জীবনে এই প্রথম আমি বিদায়-ব্যথায় কেঁদেছিলাম এবং অনুভব করেছিলাম একমাত্র বিদায়ের সময়েই আমরা বুঝতে পারি প্রিয়জনদের আমরা কতখানি ভালবাসি।

পরের দিন ছাত্র ও শিক্ষকদের তরফ থেকে একটি বিদায় সভার আয়োজন করা হল। বক্তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমার বক্তব্য আমি কী করে গুছিয়ে বলতে পেরেছিলাম জানি না, কারণ কান্নায় তখন আমার গলা বুজে আসছিল। একটা জিনিস দেখে আমি মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলাম—ব্যাপারটা যে কত বড় দুঃখের তা যেন অনেকেই বুঝতেই পারছিল না। সকলের বলা হয়ে গেলে যখন প্রধান শিক্ষকমশাই তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করলেন, তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমার কানে পেঁছেছিল। তিনি বলেছিলেন, তিনি যখন প্রথম কটকে আসেন, তিনি কল্পনাই করতে পারেননি যে তাঁর জন্য সকলের মনে এতখানি প্রীতি সঞ্চিত ছিল। তারপর তিনি কী বলেছিলেন জানিনে। আমি শুধু তাঁর আবেগোজ্জ্বল মুখের দিকে আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে ছিলাম। সে মুখে এমন একটি দীপ্তি ছিল যা একমাত্র কেশবচন্দ্র

সেনের ছবিতেই দেখেছি। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না, কারণ তিনি কেশবচন্দ্রের একজন একান্ত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন।
শুধু একজনের অভাবে স্কুলের আবহাওয়াটা যেন একেবারে নীরস, একঘেয়ে হয়ে গেল। কোনো আনন্দই রইল না। এরই মধ্যে ক্লাস, পড়াশোনা, পরীক্ষা সবই আগের মতো চলল। অনেক সময়ে দেখা যায় একজন আর একজনের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার পর তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। আমার বেলাতেও তাই হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকমশাই চলে যাবার পর তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করে দিলাম। বেশ কয়েক বছর এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি চলেছিল। তিনিই আমাকে শেখান কী করে প্রকৃতিকে ভালবাসতে হয়, প্রকৃতির প্রভাবকে জীবনে গ্রহণ করতে হয়—শুধু সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে নয় নৈতিকবোধের দিক থেকেও বটে। তাঁর উপদেশ অনুযায়ী আমি দস্তুরমতো প্রকৃতিপূজা শুরু করে দিয়েছিলাম। নদীর ধারে কিংবা পাহাড়ের গায়ে অথবা অস্তগামী সূর্যের ছটায় রাঙন নির্জন কোনো মাঠে ভালো একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে ধ্যান অভ্যাস করতাম। তিনি লিখতেন, "প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেবে, দেখবে প্রকৃতি তার অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তোমাকে প্রেরণা যোগাবে।" এইভাবে প্রকৃতির ধ্যান করে তিনি নিজেও নাকি মনে শান্তি ও একাগ্রতা লাভ করেছিলেন।
প্রকৃতির ধ্যান করে নৈতিক উন্নতি আমার কতখানি হয়েছিল জানি না। কিন্তু একটা লাভ হয়েছিল—প্রকৃতির বিচিত্র ও প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা দিয়েছিল, তাছাড়া সহজেই মনে একাগ্রতা আনতে পেরেছিলাম। বাগানে গাছপালা ও ফুল দেখতে দেখতে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম। কখনো কখনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কিংবা একাই

নদীর ধারে বা মাঠে ঘুরে বেড়াতাম—খেয়ালী প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশে মন ভরে উঠত। তখন বুঝতে পারতাম কবি কেন বলেছেন:

ছোট্ট মেঠো ফুলটি নদীর তটে
তার কাছে তা হলদে ফুলই বটে,
তবু যেন একটু কিছু আরো।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য যেন নতুন করে উপভোগ করতে শিখলাম। আর মহাভারতে এবং কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতিবর্ণনা পড়ে যে কী আনন্দ পেতাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না—ইতিমধ্যে আমাদের পণ্ডিতমশাইয়ের দয়ায় সংস্কৃতটা মোটামুটি আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম বলে মূল সংস্কৃতর রসই উপভোগ করতে পারতাম। এই সময় থেকে আমার মনের মধ্যে এক বিষম ওলটপালট শুরু হল। প্রায় বছর ছয়েক সে যে কী অসহ্য মানসিক অশান্তিতে কেটেছিল তা বলবার নয়। বাইরে থেকে অবশ্য কিছু বোঝবার জো ছিল না। এক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের পক্ষেও কিছু করবার ছিল না। এ ধরনের উৎকট অভিজ্ঞতা সাধারণত সকলের হয় বলে আমার মনে হয় না, অন্তত প্রার্থনা করি কখনো কারও যেন না হয়। তবে আমাকে আর দশজনের মতো ভাবলে ভুল করা হবে, কারণ আমার মনের গড়নটা ছিল বেশ একটু অস্বাভাবিক ধরনের। আমি যে শুধু আত্মকেন্দ্রিকই ছিলাম তা নয়, অনেক দিক দিয়ে অকালপক্কও ছিলাম। এর ফলে, যে বয়সে আমার ফুটবলমাঠে সময় কাটাবার কথা সে সময়ে আমি বসে বসে গুরুগম্ভীর নানারকম সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতাম। আমার তখনকার মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকৃত রূপটা এখন অনেকটা বুঝতে পারি।

এর দুটো দিক ছিল—প্রথমত, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার স্বাভাবিক ইচ্ছার সঙ্গে নবজাগ্রত আধ্যাত্মিক চেতনার সংঘাত। দ্বিতীয়ত, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যে যৌনচেতনা আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল তাকে অস্বাভাবিক এবং দুর্নীতিমূলক ভেবে ক্রমাগত দমন করবার চেষ্টা।

যে প্রকৃতিপূজার কথা আগে বলেছি, তাতে মনের শান্তি যে খানিকটা ফিরে পাইনি, তা নয়, কিন্তু সে আর কতটুকু! এমন একটা আদর্শের তখন আমার প্রয়োজন ছিল, যার উপরে ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারব—সবরকম প্রলোভন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। এমন একটি আদর্শ খুঁজে বের করা সহজ ছিল না। মানসিক অশান্তি আমাকে ভোগ করতে হত না, যদি আমি আর দশজনের মতো জীবনের দাবিকে সহজভাবেই মেনে নিতাম কিংবা দৃঢ়ভাবে জীবনের সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করে যে কোনো একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরতাম। কিন্তু কোনোটাই আমি পারিনি। জীবনের সাধারণ প্রলোভনে ধরা দিতে আমি রাজী ছিলাম না, কাজেই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মনের দিক থেকে আমি ছিলাম অত্যন্ত দুর্বল, তাই এই সংঘর্ষ আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রাণান্তকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনে একটা সঠিক আদর্শ খুঁজে না পাওয়ার জন্যই যে এ অবস্থা হয়েছিল তা নয়, কারণ আদর্শ আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু সেই আদর্শকে একাগ্রভাবে জীবনে অনুসরণ করা আমার পক্ষে মোটেই সহজ হয়নি। আমার ভিতরকার বিরুদ্ধ ও বিদ্রোহী ভাবগুলোকে দমন করে মনে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে দীর্ঘকাল সময় লেগেছিল, কারণ আমার শরীর মন দুইই ছিল দুর্বল।

হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই যেন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম।

আমাদের এক আত্মীয় (সুহৃৎচন্দ্র মিত্র) নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই ঘাঁটছি হঠাৎ নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। প্রধান শিক্ষকমশাই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকবোধ জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেননি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র এবং বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। "আত্মনঃ মোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতয়া"—মানবজাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। আদর্শ হিসেবে মধ্যযুগের স্বার্থসর্বস্ব সন্ন্যাসী-জীবন কিংবা আধুনিক যুগের মিল ও বেন্থামের 'ইউটিলিটারিয়া-নিজ্ম' কোনোটাই সার্থক নয়। মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের সেবাও বুঝেছিলেন। তাঁর জীবনীকার ও প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা লিখে গেছেন, "মাতৃভূমিই ছিল তাঁর আরাধ্য দেবী। দেশের এমন কোনো আন্দোলন ছিল না যা তাঁর মনে সাড়া জাগায়নি।" একটি বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "বল ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" তিনি বলতেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, একে একে

সকলেরই দিন গিয়েছে, এখন পালা এসেছে শূদ্রের—এতদিন পর্যন্ত যারা সমাজে শুধু অবহেলাই পেয়ে এসেছে। তিনি আরো বলতেন, উপনিষদের বাণী হল, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—চাই শক্তি, নইলে সবই বৃথা। আর চাই নচিকেতার মতো আত্মবিশ্বাস। অলসপ্রকৃতির সন্ন্যাসীদের তিনি বলতেন, "মুক্তি আসবে ফুটবলখেলার মধ্য দিয়ে, গীতাপাঠ করে নয়।" বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স বছর পনেরোও হবে কি না সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর আদর্শ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা তখন আমার ছিল না—কিন্তু কয়েকটা জিনিস একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রধান শিক্ষকমশাইয়ের আদর্শকে তখন আর খুব বড় বলে মনে করতে পারছিলাম না। আগে ভাবতাম প্রধান শিক্ষকমশাইয়ের মতো দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করব, তাঁর আদর্শে জীবনকে গড়ে তুলব। কিন্তু এখন স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।

বিবেকানন্দ থেকে ক্রমে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়েছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, অনেক বই লিখেছেন—সকলেই সেগুলি পড়তে পারে। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এসব কিছুই করেননি, কারণ তিনি, বলতে গেলে, প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। তিনি শুধু তাঁর আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করে গেছেন—সেই আদর্শকে সাধারণের মধ্যে প্রচার

করবার ভার নিয়েছেন তাঁর শিষ্যেরা। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তিনি যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তাঁর শিষ্যেরা তা বই বা রোজনামচার আকারে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এইসব বইয়ের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হল চরিত্রগঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে তাঁর সহজ সরল উপদেশাবলী। বারবার তিনি বলেছেন, আত্মসংযম বিনা আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব, একমাত্র অনাসক্তির মধ্য দিয়েই মুক্তি আসতে পারে। রামকৃষ্ণ অবশ্য নতুন কিছু বলেননি—হাজার হাজার বছর আগে উপনিষদই প্রচার করেছে, পার্থিব প্রলোভন ত্যাগই অমরত্ব লাভের একমাত্র উপায়। রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী এত জনপ্রিয় এবং হৃদয়গ্রাহী হবার কারণ, রামকৃষ্ণ যা উপদেশ দিতেন নিজের জীবনেও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাঁর শিষ্যদের মতে তিনি এইভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সার কথা—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। তিনি বলতেন এই দুটি প্রলোভন ত্যাগ করতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। যৌনকামনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে সব স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই মনে মাতৃভাব জাগে।

অল্পদিনের মধ্যেই আমি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের একদল ভক্ত জুটিয়ে ফেললাম। এদের মধ্যে সুহৃৎচন্দ্র মিত্রও ছিলেন। স্কুলে বা স্কুলের বাইরে. যেখানেই হোক সুযোগ পেলেই আমরা এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিতাম। অনেক সময়ে দল বেঁধে দূরে কোথাও বেড়াতে চলে যেতাম, এতে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা করবার সুযোগ পাওয়া যেত। ক্রমে আমাদের দল বেশ ভারি হয়ে উঠল। দলে একটি গাইয়ে ছেলেকে (হেমেন্দ্র সেন) পাওয়া গেল—বিশেষ করে ভক্তি-মূলক গান সে চমৎকার গাইত। দেখা গেল ঘরে বাইরে সকলেই আমাদের.

সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। আমরা যে রকম খামখেয়ালী ছিলাম তাতে অন্যে যে আমাদের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করবে সে আর বিচিত্র কি? অবশ্য ছাত্ররা আমাদের নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করতে সাহস পেত না, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। বাড়ির লোকদের নিয়েই হত যত মুশকিল। বাবা মা টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে অন্য ছেলেদের সঙ্গে আমিও প্রায়ই বাইরে বেরিয়ে যাই। প্রথম প্রথম তাঁরা ভালোকথায় আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তারপর তাতে কোনো ফল না হওয়ায় আচ্ছা করে বকুনি দিলেন। কিন্তু বকুনি খেয়ে শোধরাবার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। আমি তো আর তখন বাপমায়ের একান্ত বাধ্য সুবোধ-সুশীল বালকটি নই। নতুন আদর্শে আমার দৃষ্টি গেছে বদলে। শুধু একটি চিন্তা মাথায় ঘুরছে—এই আদর্শকে কি করে আমার জীবনে সফল করে তুলব—পার্থিব প্রলোভন, অন্যায় বাধা তুচ্ছ করে জনসেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেব। পিতামাতার প্রতি ভক্তিমূলক সংস্কৃত শ্লোকের পরিবর্তে তখন এমন সব শ্লোক মুখস্ত করতে শুরু করলাম যাতে পিতামাতার শাসন অমান্য করবারই মন্ত্রণা রয়েছে।

জীবনে আর কখনো এরকম সঙ্কটে বোধ হয় আমাকে পড়তে হয়নি। রামকৃষ্ণের আত্মসংযম ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে লাগল সংঘাত। আর বিবেকানন্দের আদর্শ মনকে সামাজিক ও পারিবারিক বাধানিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করল। আগেই বলেছি শরীর মন দুইই ছিল আমার দুর্বল, কাজেই এই মানসিক দ্বন্দ্বে জয়ী হতে আমাকে যে কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে তা বলবার নয়। কখনো আশা কখনো নিরাশা, কখনো দুঃখ কখনো আনন্দ—এইভাবে অনিশ্চয়তার

মধ্য দিয়েই আমার বহুদিন কেটেছে। মনের দ্বন্দ্বটাই বেশি পীড়াদায়ক ছিল, না বাইরের বাধাবিঘ্ন জয় করাটাই বেশি কষ্টকর ছিল তা বলা কঠিন। আমার মনের জোর যদি একটু বেশি থাকত কিংবা একটু স্থূলপ্রকৃতির হত তবে এত কষ্ট আমাকে পেতে হত না, অনেক সহজেই জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু তা না হওয়াতে আমাকে মুখ বুজে সব সহ্য করতে হয়েছে। বাবামা যতোই আমাকে বাধা দিতে চেয়েছেন আমিও ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছি। যখন অন্য কোনোভাবে আমাকে বাগে আনতে পারলেন না, মা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। কিন্তু চোখের জলেও আমার মন ভিজল না। বরং বিরক্ত হয়ে আমি আরো বেশি অবাধ্য এবং খামখেয়ালী হয়ে উঠলাম, কোনোরকম শাসনই আমার উপর খাটল না। অবশ্য এজন্য মনে মনে আমি অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করেছি। বাপমায়ের অবাধ্য হওয়া যে আমার পক্ষে কতখানি পীড়াদায়ক ছিল তা বলে বোঝানো যায় না, কারণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু আমার কাছে সবার উপরে তখন আদর্শ—সেই আদর্শের কাছে আর সবই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে খারাপ লাগত যখন দেখতাম বাড়িতে কেউই আমাকে অন্তরঙ্গভাবে বুঝতে চেষ্টা করছে না, আমার ভিতরে যে অসহ্য দ্বন্দ্ব চলছে তার খোঁজ রাখছে না। একমাত্র সান্ত্বনা পেতাম বন্ধুদের কাছে—কাজেই যতক্ষণ বাড়ির বাইরে বন্ধুদের মাঝে থাকতাম অতটা কষ্ট হত না।

লেখাপড়ায় আর মন বসতে চাইত না। শুধু গোড়ার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম বলেই কোনোরকমে মান রক্ষা হয়েছিল, নয়তো একেবারে তলিয়ে যেতাম। লেখাপড়া ছেড়ে এখন আমার একমাত্র কাজ হল যোগ অভ্যাস করা। যোগ শেখাতে পারে

এরকম গুরু তখনো আমার জোটেনি, কাজেই বই পড়ে যতটুকু শেখা যায় তাই দিয়েই কাজ চালাতাম। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে এজাতীয় বই অধিকাংশই বাজে লোকের লেখা, যাদের উপর কোনো-মতেই নির্ভর করা চলে না। ব্রহ্মচর্য, যোগ, হঠযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে এই ধরনের অনেক বই বাজারে পাওয়া যেত। আমরা সাগ্রহে এইসব কিনে পড়তাম, এবং এগুলিতে যেসব নিয়মকানুন দেওয়া থাকত সেগুলি বিনাদ্বিধায় পালন করতাম। এ ছাড়া আরো কত রকমের বিচিত্র সব অনুষ্ঠান যে পালন করা হত তার একটা বিবরণ দিলে প্রচুর হাসির খোরাক মিলবে। সে সময়ে আমাকে অনেকে কেন পাগল ভাবত, এখন সেটা বুঝতে পারি।

প্রথম যখন যোগ অভ্যাস করব বলে ঠিক করলাম তখন একটা সমস্যা দেখা দিল—ভেবেই পাচ্ছিলাম না লোকচক্ষু এড়িয়ে কী ভাবে কাজটা করা যায় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কেউ আমাকে দেখে ফেলে তবে কী করে ঠাট্টাতামাশার হাত থেকে বাঁচা যাবে। ঠিক করলাম সন্ধ্যার পর বসা যাবে তাহলে অন্ধকারে সহজে আমাকে কেউ দেখতে পাবে না। কয়েকদিন বেশ নির্বিঘ্নেই কাটল, কিন্তু হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেলাম। সে এক ভারি মজার ব্যাপার। অন্ধকার ঘরে বসে যোগ অভ্যাস করছি, এমন সময়ে ঝি বিছানা করবার জন্যে সেই ঘরে ঢুকে অন্ধকারে হুড়মুড় করে একেবারে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। আলো জ্বালাবার পর আমাকে ওভাবে দেখে বেচারা কি রকম হতভম্ব হয়েছিল, বুঝতেই পারেন।

যোগ অভ্যাসের নানারকম প্রক্রিয়া ছিল। সাধারণত যেটা অনুসরণ করা হত সেটা এই—শাদা খানিকটা জায়গার ঠিক মাঝখানে একটা কালো বৃত্ত এঁকে সেই বৃত্তের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ

পর্যন্ত না মন সম্পূর্ণ সমাধিস্থ হয়। কখনো কখনো নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মনকে সমাধিস্থ করা হত। সবচেয়ে কষ্টকর ছিল মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার প্রক্রিয়া। নানারকম কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যবস্থাও ছিল—যেমন নিরামিষ আহার, প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, শরীরের শীতগ্রীষ্মানুভূতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

এসবই অত্যন্ত গোপনে সমাধা করতে হত—সে ঘরের লোকের কাছেই হোক বা বাইরের কারুর কাছেই হোক। রামকৃষ্ণের একটি প্রিয় উপদেশ ছিল: বনে বা নির্জন কোনো জায়গায়, ঘরে বা মনে মনে—যেখানেই হোক এমনভাবে যোগ অভ্যাস করবে যাতে বাইরে থেকে কেউ টের না পায়। জানবে শুধু তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যারা নিজেরা যোগ অভ্যাস করে, আর জানবে সহ-যোগীরা।

এইভাবে কিছুদিন যোগ অভ্যাস করবার পর আমরা পরস্পরের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। রামকৃষ্ণ একটা জিনিস বিশেষ করে সকলকে বলতেন। যোগে সিদ্ধি লাভ করলে অনেকেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন—কিন্তু সেইজন্য অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে কেউ যদি আত্মপ্রচার বা শক্তির অপব্যবহার করতে শুরু করেন তবে তার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমশিখরে উঠতে হলে এই প্রলোভন ত্যাগ করতেই হবে। মাসের পর মাস যোগ করবার পরও আমার মধ্যে এই ধরনের কোনো অলৌকিক শক্তি অনুভব করিনি, তবে আগের চাইতে আমার আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযম অনেক বেড়ে গিয়েছিল, মানসিক শান্তিও অনেকটা ফিরে পেয়েছিলাম। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। ভাবলাম হয়তো একজন গুরুর অভাবেই সাধনা আর এগোচ্ছে না—অনেককেই বলতে শুনতাম কিনা গুরু বিনা যোগসাধনা কখনো সফল হয় না। অগত্যা গুরুর সন্ধানে মন দিলাম।

আমাদের দেশে সংসারত্যাগী যোগীরা অনেকেই পরিব্রাজকের জীবন-যাপন করেন কিংবা তীর্থস্থানগুলিতে ঘুরে বেড়ান। কাজেই হরিদ্বার, বারাণসী, পুরী (বা জগন্নাথ) কিংবা রামেশ্বরম—যে কোনো তীর্থে এদের দেখা মেলে। পুরীর কাছাকাছি বলে কটকেও এই ধরনের সাধুসন্ন্যাসীর ভিড় লেগেই থাকত। এই সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে আবার দুটো শ্রেণীবিভাগ আছে—একদল হল আশ্রম বা মঠবাসী, আর একদল তারা কোনো দল বা সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত প্রকৃতির। আমাদের কাছে অবশ্য কোনো বাছবিচার ছিল না। শহরে কোনো সাধুসন্ন্যাসী এসেছে একবার খোঁজ পেলেই হল, সবাই ছুটতাম তার দর্শন নিতে। এইভাবে কত বিচিত্র ধরনের লোকের যে দেখা পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। এদের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগত সত্যিকার সংসারবিমুখ নির্লিপ্তপ্রকৃতির সাধুদের। এরা কখনো চেলা খুঁজে বেড়ায় না, এবং কারুর কাছ থেকে অর্থও কখনো গ্রহণ করে না। যদি কাউকে এরা শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করে তবে তাকে এদেরই মতো সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিতে হবে। বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বিবাহিত সাধুদের আমার মোটেই ভালো লাগত না। এদের প্রধান উদ্দেশ্যই হল ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করা, যাতে দরকার মতো তাদের শোষণ করাও চলে।

একবার এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এলেন কটকে। নব্বুই কি তারও বেশি তাঁর বয়স। ভারতবর্ষের একটি বিখ্যাত আশ্রমের অধ্যক্ষ তিনি। কটকের একজন নামকরা ডাক্তার এঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁকে দেখবার জন্য সারা কটক শহরে যেন ধুম পড়ে গেল। দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে আমরাও ভিড়ে পড়লাম। যথাস্থানে পেঁছে সাধুজীকে প্রণাম করবার পর আমরা সকলে তাঁকে ঘিরে বসলাম। অত্যন্ত প্রসন্নভাবে আমাদের

সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বললেন। তাঁর ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। পরে তাঁর কয়েকজন শিষ্য স্তোত্রপাঠ করলেন। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা শুনলাম। বিদায় দেবার সময়ে তিনি আমাদের তাঁর ছাপানো উপদেশাবলী দিয়ে সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে বলে দিলেন। আর সকলের কথা জানি না, আমি তো মনে মনে সংকল্প করলাম উপদেশগুলো ঠিকমতো পালন করব। প্রথম উপদেশ হল—মাছ, মাংস বা ডিম কোনোটাই খাওয়া চলবে না। আমাদের বাড়িতে আবার নিরামিষের চাইতে আমিষটাই বেশি চলত, কাজেই এই উপদেশ পালন করা খুব সহজ হয়নি—যথেষ্ট বাধা পেতে হয়েছে, বকুনি খেতে হয়েছে। কিন্তু শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমি উপদেশ পালন করেছিলাম। দ্বিতীয় উপদেশ, দৈনিক কতকগুলি স্তোত্র পাঠ করা। এটা সহজেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এর পরের উপদেশটাই ছিল একটু গোলমেলে—বাপমায়ের বাধ্য হওয়া। সকালে উঠে প্রথমেই বাবা মাকে প্রণাম করতে হবে। আগে কখনো বাবা মাকে এভাবে প্রত্যেক দিন প্রণাম করিনি। তাছাড়া নির্বিচারে বাপমায়ের সব কথাই মেনে নেওয়ার কোনো সার্থকতা আছে বলে আমি বিশ্বাস করতাম না। বরঞ্চ আমার আদর্শের পথে সব রকম বাধাকেই, সে বাপমায়ের কাছ থেকেই আসুক বা অন্য কোনো দিক থেকেই আসুক, তুচ্ছ করব বলে দৃঢ়সংকল্প ছিলাম। যাই হোক, উপদেশ মানতেই হবে, কাজেই একদিন সকালবেলা চোখমুখ বুজে কোনোরকমে সটান গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে ফেললাম। আজও পরিষ্কার মনে পড়ে—এই আকস্মিক ব্যাপারে বাবা কী রকম অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। আমার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি, কিন্তু আমি একটি কথাও না বলে ঠিক যেমন এসেছিলাম তেমনি মুখ বুজে

বেরিয়ে এলাম। মায়ের বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটল। আজ পর্যন্ত জানি না সে সময়ে বাবা কিংবা মা আমার সম্বন্ধে কী ভেবেছিলেন। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে এই কর্তব্যটি সমাপন করতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। বাড়ির সকলেই, এমন কি চাকরবাকরেরা পর্যন্ত আমার মতো বেয়াড়া ছেলেকে হঠাৎ এরকম বাধ্য হয়ে যেতে দেখে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়েছিল। এই ব্যাপারটার পেছনে যে একজন সাধুর অলক্ষিত প্রভাব কাজ করছিল আশা করি কেউ ঘুণাক্ষরেও তা বুঝতে পারেনি। কিছুদিন পরে, যখন খতিয়ে দেখতে গেলাম উপদেশগুলি পালন করে আমার কোনো লাভ হয়েছে কি না তখন নিরাশ হতে হল। অগত্যা এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে নিয়ে পড়লাম। মনকে বোঝালাম—সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হতে না পারলে মুক্তি অসম্ভব।

ধর্মচর্চা বলতে আমি শুধু যোগ অভ্যাসকেই জানতাম—একথা বললে ভুল বলা হবে। অবশ্য কিছুদিন আমি যোগ নিয়ে একটু বেশি রকম মেতে উঠেছিলাম, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জনসেবা অপরিহার্য। এই ধারণা বিবেকানন্দই আমাকে দিয়েছিলেন, তিনিই জনসেবা তথা দেশসেবার আদর্শ প্রচার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দারিদ্রের সেবাকেও তিনি অবশ্য কর্তব্য বলে স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে ভগবান আমাদের কাছে আসেন, কাজেই দরিদ্রের সেবা মানেই ভগবানের সেবা। মনে পড়ে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ভিক্ষুক, ফকির, সাধুসন্ন্যাসী—সকলের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করতাম। বাড়িতে এরা কেউ এলে তাদের যথাসাধ্য দান করে মনে মনে অদ্ভুত আনন্দ পেতাম।

তখনো আমার ষোলো পূর্ণ হয়নি, সেই প্রথম পল্লীসংস্কারের অভিজ্ঞতা হল। কটকের প্রান্তে একটি গ্রামে দলবেঁধে এগিয়ে আমরা পল্লীসংস্কারের কাজ শুরু করলাম। গ্রামের একটি স্কুলে ঢুকে কিছুটা শিক্ষকতা করা গেল। স্কুলের শিক্ষকেরা এবং গ্রামের লোকেরাও আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাল। আমরা খুব উৎসাহ পেলাম। এর পর আর একটি গ্রামে গেলাম, কিন্তু আমাদের স্রেফ বোকা বনে যেতে হল। আমাদের গ্রামে ঢুকতে দেখেই গ্রামের লোকেরা দলবেঁধে আমাদের কাছ থেকে সরে পড়তে লাগল। তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে দু'একটা কথা বলা দূরে থাক, তাদের নাগাল পাওয়াই দুষ্কর হয়ে উঠল। যখন দেখলাম তারা আমাদের শুধু যে স্বজন বলে মানতে রাজী নয় তা নয়, আমাদের তারা দস্তুরমতো শত্রুপক্ষ বলেই মনে করে, তখন আমাদের হতাশার সীমা রইল না। তবে তাদের ব্যবহারে একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম—আমাদের আগে তথাকথিত যত ভদ্রলোকই এখানে এসে গেছেন তাঁরা হয় ট্যাক্স-কালেক্টর বা ঐ জাতীয় কোনো পেশা নিয়ে এসেছেন এবং গ্রামের লোকদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছেন যার ফলে আজ আমাদের ও গ্রামবাসীদের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান দেখা দিয়েছে। কয়েক বছর পরে উড়িষ্যার আরো কয়েকটা গ্রামেও আমার একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

যতদিন স্কুলে ছিলাম অন্যান্য ব্যাপারে অকালপক্ক হলেও রাজনৈতিক জ্ঞান আমার সামান্যই ছিল। এর একটা বড় কারণ রাজনীতির দিকে আমার তেমন ঝোঁক ছিল না, বাড়িতেও রাজনীতির চর্চা বিশেষ হত না। তাছাড়া গোটা উড়িষ্যাটাই রাজনীতির দিক থেকে অত্যন্ত পেছিয়ে ছিল। দাদাদের মুখে কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে মাঝে

মাঝে কথাবার্তা শুনতাম, কিন্তু সে শোনা পর্যন্তই। ১৯০৮ সালে প্রথম যখন রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বোমা ব্যবহার করা হয়, দেশের চারদিকেই বেশ একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যেও সাময়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আমি তখন পি. ই. স্কুলে পড়ি। প্রধানশিক্ষয়িত্রী বোমা ছোঁড়ার বিরুদ্ধে আমাদের খুব উপদেশ শোনালেন। ব্যাপারটা অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই চাপা পড়ে গেল। সেই সময়ে বঙ্গবিভাগ নিয়ে খুব গোলমাল চলছিল। বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে শহরে মিছিল বেরোত। একই সঙ্গে স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের জন্য আন্দোলনও চলেছিল। আমরা স্বভাবতই এসব ব্যাপারে কাজে না হোক মনে মনে খানিকটা ঝুঁকেছিলাম। কিন্তু আমাদের বাড়িতে রাজনীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কাজেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমরা করতাম কি, খবরের কাগজ থেকে বিপ্লবীদের ছবি কেটে কেটে পড়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখতাম। একদিন আমাদের এক আত্মীয় আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলেন। তিনি ছিলেন পুলিশ অফিসার। আমাদের ঘরে ঢুকে বিপ্লবীদের ছবি দেখে তিনি বাবাকে সাবধান করে দিলেন, ফলে স্কুল থেকে ফিরে এসে আমরা দেখলাম সেসব ছবি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। আমাদের কী রকম খারাপ লেগেছিল বুঝতেই পারেন।

১৯১১ সালের ডিসেম্বর অবধি রাজনৈতিক চেতনা আমার এত কম ছিল যে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধাও জাগেনি। সাধারণত ইংরিজি রচনায় আমিই সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতাম, কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় আমার ভাগ্যে পুরস্কার জুটল না। বড়দিনের

সময়ে পঞ্চম জর্জ কলকাতায় এলেন, বাড়ির আর সকলের সঙ্গে আমিও তখন সেই উপলক্ষে কলকাতায় বেড়াতে গেলাম। ফিরে এলাম যখন সম্রাটের দর্শন লাভ করে মন আনন্দে ভরপুর।

প্রথম রাজনৈতিক প্রেরণা পেয়েছিলাম আমি ১৯১২ সালে আমারই বয়সী একটি ছাত্রের (হেমন্তকুমার সরকারের) কাছ থেকে। ছেলেটি কটক ও পুরীতে বেড়াতে এসেছিল। প্রধানশিক্ষকমশাই বেণীমাধব দাস তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ছেলেটি কলকাতার একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য ছিল—এই দলের আদর্শ ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং দেশসেবা। (এই দলের নেতা ছিল সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি বলে একটি ছেলে। ছেলেটি ডাক্তারী পড়ত।) সমাজ ও দেশের নানা সমস্যা নিয়ে মাত্র মাথা ঘামাতে শুরু করেছি এমনি সময়ে ছেলেটির আবির্ভাব। আমাদের দলে একজন ছেলে সে যোগের চেয়ে দেশসেবাতেই বেশি বিশ্বাস করত। আর একজন ছেলে বাঙালী যোদ্ধা সুরেশ বিশ্বাসের মতো হবার স্বপ্ন দেখত—কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস দক্ষিণ আমেরিকায় (বোধ হয় ব্রাজিল) গিয়ে সেখানে যথেষ্ট নাম কিনেছিলেন। আমার বন্ধুটি সুরেশ বিশ্বাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার জন্য খুব কুস্তি লড়ত—আমরা তখন যোগ অভ্যাস করতেই ব্যস্ত। আগন্তুক ছেলেটি একদিন সুযোগ বুঝে দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে আবেগের সঙ্গে বহু উপদেশ দিল। তাদের কলকাতার দলের বিচিত্র কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক খবরও তার কাছে পাওয়া গেল। সব শুনে আমি তো মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কলকাতার মতো বড় শহরের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হওয়ার মধ্যে যে গৌরব আছে তার লোভে আমরা সকলেই ছেলেটির আবির্ভাবকে ভগবানের আশীর্বাদ বলেই মনে করলাম। কলকাতায় ফিরে গিয়ে

ছেলেটি তার দলের কাছে আমাদের সম্বন্ধে একটি বিবৃতি পেশ করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সেই দলের প্রধানের কাছ থেকে সেই সূত্রে আমরা চিঠি পেলাম। এইভাবে দলটির সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ ঘটল বেশ কয়েক বছর তা টিঁকে ছিল।

স্কুল ছাড়বার সময় যতোই এগিয়ে আসতে লাগল, আমার মধ্যে ধর্মভাবও তেমনি তীব্রতর হয়ে উঠল। লেখাপড়ায় মন রইল না। আমাদের একমাত্র কাজ হল তখন দলবেঁধে বাইরে গিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা। শিক্ষকদের দু-একজন বাদে কাউকেই আমাদের ভালো লাগত না। যে দু-একজনকে ভালো লাগত তাঁরা ছিলেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভক্ত। এই সময়ে বাবা মার গুরুদেব কটকে এলেন। (ইনি বাবা মার প্রথম গুরু, এঁর মৃত্যুর পর তাঁরা আর এক গুরুর কাছে দীক্ষা নেন।) তিনি আমার মধ্যে ধর্মভাব আরো বেশি করে জাগিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর প্রভাব আমার উপর খুব বেশি খাটল না, কারণ তিনি 'সন্ন্যাসী' ছিলেন না। শিক্ষকদের মধ্যে একজনেরই মাত্র রাজনৈতিক চেতনা কিছুটা ছিল। স্কুলের পড়া শেষ করে যখন আমি কলকাতায় আসার জন্য তোড়জোড় করছি, তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন, বললেন কলকাতায় গেলে অনেক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা হবে, তাতে আমার রাজনৈতিক চেতনা বাড়বে।

ছেলেবেলায় আমাদের যেসব অভিজ্ঞতা হয় তার স্মৃতি বহুদিন পর্যন্ত টিঁকে থাকে এবং মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। মনে পড়ে ছোটোবেলায় চাকরবাকর বা বাড়ির বয়স্কদের কাছে খুব ভূতের গল্প শুনতাম। একটা বিশেষ গাছ ভূতের আস্তানা বলে পরিচিত ছিল। রাত্তিরে যখন ভূতের গল্প শুনতাম ভয়ে আমার হাতপা হিম

হয়ে যেত। রাত্তিরে জমাট একটি ভূতের গল্প শুনে জ্যোৎস্নারাত্রের আলো-আঁধারে গাছের উপর ভূতের দেখা পাওয়া মোটেই আশ্চর্য ছিল না। আমাদের মুসলমান বাবুর্চি তো একদিন রাত্রে বলে বসল তাকে ভূতে পেয়েছে। কী করা যায়! শেষটায় ওঝা ডেকে সেই ভূত তাড়ানো হল। এই ধরনের ব্যাপার আরো কয়েকটা ঘটেছিল। আমাদের একজন মুসলমান কোচোয়ান নিজেকে একজন ওস্তাদ ভূতের ওঝা বলে জাহির করত। সে নাকি কব্জির কাছটায় চিরে ভূতকে সেই রক্ত খাইয়ে বিদায় করত। তার কথা কতখানি সত্যি বুঝতাম না, তবে একথা ঠিক যে তার কব্জির কাছে পুরনো ক্ষতচিহ্ন তো ছিলই, নতুন ক্ষতও প্রায়ই দেখতে পেতাম। সে একটু আধটু হাকিমিও জানতো এবং অজীর্ণ, পেটের অসুখ ইত্যাদি রোগের নানারকম ওষুধ তৈরি করত। ছেলেবেলার এইসব অভিজ্ঞতা সহজে মন থেকে লুপ্ত হয়নি। বড় হয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় আমি এদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছি।

মনকে এইসব কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে বিবেকানন্দই আমাকে সাহায্য করলেন। তিনি যে ধর্মপ্রচার করতেন, যে যোগসাধনায় বিশ্বাস করতেন—সবেরই মূলভিত্তি ছিল বেদান্ত এবং বেদান্তকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। তাঁর জীবনের একটা বড় আদর্শ ছিল ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো। তাঁর মতে এই সমন্বয় বেদান্তের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

শিশুশিক্ষা নিয়ে যাঁরা এদেশে গবেষণা করেন একটা জিনিস তাঁদের লক্ষ্য করা একান্ত দরকার: আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মন অনেক প্রতিকূল প্রভাবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে—যেমন ধরুন, শিশুকে ঘুম পাড়াবার জন্য মা, মাসী পিসী বা ঝি—এরা যে সমস্ত ঘুমপাড়ানি

গান গেয়ে থাকে, শিশু খেতে না চাইলে তাকে জোর করে খাওয়াবার জন্য যেসব কথা বলে তাকে ভোলান হয়—প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য শিশুকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাঁসিল করা। বাঙলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঘুমপাড়ানি গান হল—'ঘুমপাড়ানি মাসীপিসী, বর্গী এলো দেশে...।' বর্গীদস্যুদের নৈশ অভিযানের কাহিনী শিশুদের মনে আতঙ্কেরই সৃষ্টি করে এবং তার ফল যে ভালো হতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য।

শিশুরা সাধারণত যেসব স্বপ্ন দেখে তাদের জাগ্রত জীবনেও তার প্রভাব খানিকটা থেকে যায়। মনস্তত্ত্ব ও স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে অভিভাবক বা শিক্ষকের পক্ষে শিশুমন বোঝা অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে এবং তখন সবরকম অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করা সম্ভব হয়। ছেলেবেলায় আমি প্রায়ই সাপ, বাঘ, বাঁদর ইত্যাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত ভয়াবহ সব স্বপ্ন দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতাম—এজন্যই এসব কথা তুললাম। বড় হয়েও যৌনবিষয়ক স্বপ্ন, য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষার স্বপ্ন, গ্রেপ্তার এবং কারাবাসের স্বপ্ন—ইত্যাদি নানারকম দুঃস্বপ্ন প্রায়ই আমাকে কষ্ট দিত। পরে যখন যোগ অভ্যাস করি সে সময়ে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই ধরনের দুঃস্বপ্নের হাত থেকে চিরকালের জন্য রেহাই পেয়েছিলাম।

একটা জিনিস একমাত্র ভারতবর্ষেই এবং বিশেষ করে রক্ষণশীল গোঁড়া পরিবারেই দেখা যায়। এদেশে ছেলেদের বয়স বাড়ে, তারা য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রীও পায়, কিন্তু তাদের নাবালকত্ব আর ঘুচতে চায় না, মনের কোনো প্রসারই তাদের হয় না। অবিশ্যি সময়ে সময়ে যে অনেকে পরিবার ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না, তা নয়। এদিক থেকে আমার ভাগ্যটা ছিল ভালো। আমাদের পরিবারে কোনো

রকমের সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি ছিল না—ফলে আমার মন স্বভাবতই উদার হয়ে গড়ে উঠেছিল। ছেলেবেলায় প্রথমেই ইংরিজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলাম, ইংরেজদের সঙ্গে মিশেছিলাম। এরপর আমার নিজের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচিত হলাম। যখন স্কুলে পড়ি তখন থেকেই বিভিন্ন প্রদেশের ছেলেদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল—বাঙলাদেশে থাকলে যেটা হত কি না সন্দেহ। মুসলমানদের সম্বন্ধে আমার উদার মনোভাবের জন্যও ছেলেবেলার অভিজ্ঞতাই বহুল পরিমাণে দায়ী। আমাদের বাড়ি ছিল মুসলমান এলাকায়। প্রতিবেশীরাও প্রায় সকলেই ছিল মুসলমান। বাবাকে এরা সকলেই খুব শ্রদ্ধা করত। আমরাও মুসলমানদের মহরম ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম। আমাদের চাকরদের মধ্যেও কয়েকজন ছিল মুসলমান, আর সকলের মতো তারাও আমাদের খুব অনুরক্ত ছিল। স্কুলে মুসলমান শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। সত্যি বলতে কি মস্‌জিদে গিয়ে উপাসনা করা ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই আমি আমাদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো প্রভেদ দেখতাম না। তাছাড়া তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রেষারেষি বা ঝগড়াঝাঁটি মোটেই ছিল না।

যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছিলাম সেটা মোটামুটি উদারভাবাপন্ন হলেও অনেক ক্ষেত্রে সমাজ ও পরিবারের বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। আমার বয়স যখন চোদ্দ কি পনেরো সে সময়কার একটি ঘটনার কথা বলি। প্রতিবেশী আমার এক সহপাঠী (দেবেন দাস) একদিন আমাদের কয়েকজনকে তার বাড়িতে খেতে বলে। মায়ের কানে কথাটা যেতেই তিনি স্রেফ আমাদের যেতে বারণ করে বসলেন। হয়তো বন্ধুটি আভিজাত্যে আমাদের চাইতে ছোটো ছিল

কিংবা আমাদের চেয়ে নিচু জাতের ছিল বলেই মা আপত্তি করেছিলেন, কিংবা হয়তো বাইরে খেলে অসুখবিসুখ হতে পারে এরকম আশঙ্কা করেছিলেন। আমরাও বাস্তবিকই বাইরে খুব কমই খেতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে মায়ের আপত্তি আমার কাছে অত্যন্ত অসঙ্গত বলে মনে হল। আমি মায়ের নিষেধ অমান্য করেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম—এবং এতে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দও যেন অনুভব করেছিলাম। পরে যখন ধর্মচর্চা ও যোগসাধনা উপলক্ষে অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ত, অনেক জায়গায় যেতে হত—তখন প্রায়ই বাবা-মার নিষেধ অমান্য করতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য মনে কিছুমাত্র দ্বিধাও জাগেনি, কারণ তখন বিবেকানন্দের আদর্শ আমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি—বিবেকানন্দ বলতেন আত্মোপলব্ধির জন্য সব বাধাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে। ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু যে কাঁদে, তার কারণ আর কিছুই নয়, যে বাধানিষেধের গণ্ডির মধ্যে সে ভূমিষ্ঠ হয় তার বিরুদ্ধে তার স্বাধীনসত্তা বিদ্রোহ করে ওঠে।

আমার স্কুলজীবনের কথা ভাবলে বুঝতে পারি অনেকেই আমাকে সে সময়ে অত্যন্ত খামখেয়ালী, বেয়াড়া প্রকৃতির বলে মনে করতেন। আমার অভিভাবকেরা এবং স্কুলের শিক্ষকেরা সকলেই খুব আশা করেছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমি খুব ভালো করব, স্কুলের নাম রাখবো। কিন্তু আমি যখন লেখাপড়া ছেড়ে সাধুসন্ন্যাসীদের নিয়ে মেতে উঠলাম তখন তাঁদের নিরাশ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। আমার উপর বাবা-মায়ের অনেক আশা-ভরসা ছিল, কাজেই আমার এই পরিবর্তনে তাঁদের অবস্থা কী রকম দাঁড়িয়েছিল সেটা সহজেই অনুমেয়। আমি এসব জিনিসকে মোটেই আমল দিতাম না, আমার কাছে আদর্শটাই তখন সবচেয়ে বড়। কোনোরকম বাধানিষেধই আমি

মানতাম না। বাধা পেলে আমার জেদ আরো বেড়ে যেত। বাবা-মা ভাবলেন স্থানপরিবর্তন করলে হয়তো আমার এইসব খামখেয়ালী কমে যাবে। অতএব আমাকে কলকাতায় পাঠানো স্থির হল।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। যখন ফল বেরোলো দেখা গেল আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। বাবা-মা স্বভাবতই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এর পরই আমি কলকাতায় চলে এলাম।

প্রেসিডেন্সি কলেজ (১)

কলকাতা যে আমার পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়াবে এটা বাবা-মা কল্পনাও করতে পারেননি। কটকে আমারই মতো খেয়ালী একদল স্কুলের ছাত্রকে নিয়ে যে দল গড়ে তুলেছিলাম তাদের সংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্যই আমাকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। কটকের বন্ধুদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটল, কিন্তু কলকাতায় এসে ওরকম একটি দল পাকাতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হল না, কারণ এখানে আমার মতো খেয়ালী ছেলের কোনো অভাব ছিল না। বুঝতেই পারছেন এসব দেখেশুনে বাবা-মা আমার সম্বন্ধে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কলকাতায় অবিশ্যি এই আমার প্রথম নয়। ছেলেবেলায় আরো অনেকবার কলকাতায় এসেছি—এবং প্রত্যেকবারই এই বিরাট শহরটি বিস্ময়ে আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিয়েছে। কলকাতার চওড়া রাস্তাগুলি ধরে হাঁটতে কিংবা এখানকার বড় বড় বাগান ও যাদুঘরে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগত, মনে হত এসব কোনোদিনই পুরনো হবে না। এ যেন অনেকটা যাদুঘরে রক্ষিত অতিকায় একটি জলজন্তুর মতো—বাইরে থেকে যতোই দেখা যায় ভালো না লেগে যায় না। কিন্তু এবার তো আগেকার মতো কলকাতায় বেড়াতে

আসিনি. থাকতে এসেছি, কাজেই কলকাতার আসল রূপটির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম। তখন কে জানত এই পরিচয়ের জের আমার সারা জীবন ধরেই চলবে।

অন্য যে কোনো বড় শহরের মতো কলকাতার জীবনও সকলের ঠিক সহ্য হয় না—অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রতিভাবান ছেলেরা কলকাতায় এসে একেবারে বিগড়ে গেছে। আমি যদি আগে থেকেই বিশেষ একটা আদর্শ না নিয়ে কলকাতায় আসতাম তবে আমার অবস্থাও হয়তো তাই দাঁড়াত। স্কুল ছাড়বার পর থেকেই আমার মনে বড় রকমের একটা ওলটপালট চলছিল সত্যি, কিন্তু তার মধ্যেই আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছিলাম—ঠিক করেছিলাম বাধাবিপত্তি যাই আসুক না কেন গড্ডালিকাপ্রবাহে কখনো গা ভাসাবো না। জনসেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই হবে আমার জীবনের লক্ষ্য। জীবনের মূল সমস্যাগুলি যাতে সমাধান করতে পারি তার জন্য দর্শনশাস্ত্র বেশ ভালো করে পড়ব বলে স্থির করলাম। দৈনন্দিন জীবনে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ ছিলেন আমার আদর্শ। আমি যে অর্থোপার্জনের দিকে কখনো যাবো না সে সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত ছিলাম। কলকাতায় আসবার সময়ে এই ছিল আমার দৃষ্টিভঙ্গী। এইসব সংকল্প কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপদেশ বা এক রাত্রির চিন্তার ফল বলে মনে করলে ভুল করা হবে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এইসব সিদ্ধান্তে পেঁৗছেচি। এজন্য কত বই যে পড়েছি, কত গুরুর পদতলে বসেছি তার ইয়ত্তা নেই। এত সাধনার পর জীবনের সঠিক আদর্শটি খুঁজে পেয়েছিলাম। এতখানি বেগ পেতে হত না যদি আরো বড় বাধা আমার পথরোধ না করত। একদিকে পারিবারিক অনুশাসন, আর একদিকে পার্থিব.

ভোগসুখের প্রতি মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ—এই দুয়ের প্রতিকূলতায় জীবনের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা আমার পক্ষে প্রাণান্তকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে স্কুল-জীবনের শেষের দিকটা তো আমাকে চূড়ান্ত মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে। অবিশ্যি কোনো একটা আদর্শকে জীবনে সফল করে তুলতে গেলে সকলকেই এই রকম অশান্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু দুটো কারণে আমার বেলা অশান্তির মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে পড়েছিল। প্রথমত আমার বয়স ছিল অল্প। দ্বিতীয়ত সবগুলি বাধা যেন একসঙ্গে এসে আমাকে ঘিরে ধরেছিল। একই সঙ্গে দুটো বাধার সঙ্গে লড়তে না হলে বোধ হয় এত কষ্ট পেতে হত না। কিন্তু ভাগ্যের লিখনকে তো আর খণ্ডান যায় না।

এইভাবে দুদিক সামলাতে আমাকে যে কী পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছে তা বলবার নয়। বিশেষ করে আমার মতো প্রখর-অনুভূতি-সম্পন্ন ছেলের পক্ষে এই সংঘাত প্রায় মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি যে ভেঙে পড়িনি সেটা বোধ হয় নেহাতই ভাগ্যের জোর কিংবা নিয়তির নির্দেশ। জীবনের এই অগ্নিপরীক্ষায় আমি প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই বেরিয়ে এসেছি। পিছনে ফেলে আসা দুঃস্বপ্নের মতো এই দিনগুলির কথা ভাবলে এখন বুঝতে পারি আমার জীবনে এই অভিজ্ঞতার দরকার ছিল। এই সংগ্রামে আমাকে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে সত্যি, কিন্তু তার পুরস্কার আমি পেয়েছি—আগের চেয়ে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে, আর আমার জীবনের মূল কয়েকটি নীতিও আমি স্থির করতে পেরেছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বাপ-মা এবং অভিভাবকদের একটা বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাই—অভিমানী এবং অনুভূতিসম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার

কখনো যেন রূঢ় না হয়। কারণ, তাঁদের স্বাভাবিক ইচ্ছায় যতোই বাধা দেওয়া যায় ততোই তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এবং শেষটায় একেবারে বেয়াড়া হয়ে যায়। বাপমায়েরা বরং যদি এ ধরনের ছেলেদের অস্বাভাবিকতাকে খানিকটা মেনে নিয়ে তাদের বুঝতে চেষ্টা করেন, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তবে হয়তো তাদের খামখেয়াল, অস্বাভাবিকতা সব আস্তে আস্তে সেরে যাবে। ঈশ্বর, আত্মা এবং ধর্ম—এসবে বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত কি না সে প্রশ্নের জবাব আমার পক্ষে দেওয়া সহজ নয়, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি অল্প বয়স থেকে ধর্মচর্চা ও যোগসাধনায় মন দিয়ে আমি একটা বড় জিনিস লাভ করেছিলাম। জীবনধারণের দায়িত্ব যে কতখানি তা বেশ ভালো করেই বুঝতে শিখেছিলাম। কলেজ-জীবনে প্রবেশ করবার সময়ে জীবন সম্বন্ধে আমার মনে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল, বুঝেছিলাম জীবনের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে এবং এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরীর ও মনের নিয়মিত অনুশীলনের প্রয়োজন। স্কুল-জীবনে যদি শরীর মনকে এভাবে তৈরি না করতাম তবে আমার স্বাস্থ্য যে রকম খারাপ ছিল তাতে পরবর্তী জীবনের ঝড়ঝাপটা সামলে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হত কি না সন্দেহ।

আগেই বলেছি প্রথমজীবনে আমি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম—প্রচলিত সমাজব্যবস্থা এবং নৈতিক-বোধের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ ঘটেনি। প্রত্যেকের জীবনেই এরকম হয়। তারপরই আসে সংশয়—ডেকার্টের বুদ্ধিমূলক সংশয় শুধু নয়, সমগ্র জীবন সম্বন্ধেই এই সংশয়। একে বলা চলে জীবন-জিজ্ঞাসা। কেন এই পৃথিবীতে এসেছি? জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী? মানুষ মাত্রেরই মনে তখন এইসব প্রশ্ন জাগে। যদি এই প্রশ্নের সঠিক

কোনো সমাধান সে খুঁজে পায় তবে অনেক সময় দেখা যায় তার জীবনদর্শনে বড়রকমের পরিবর্তন ঘটেছে—সবকিছুই তখন সে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে শুরু করে এবং প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শগুলিকে যাচাই করে দেখবার জন্য স্বকীয় কতকগুলি মূল্যবোধ নিয়ে বাস্তবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। এই সংগ্রামে হয় সে নিজের আদর্শ অনুযায়ী পারিপার্শ্বিককে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, কিংবা পরাজয় স্বীকার ক'রে বাস্তবের কাছে আত্মসমর্পণ করে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষের এই সংশয় তার জীবনদর্শনকে কতখানি প্রভাবান্বিত করে তা নির্ভর করে সম্পূর্ণ তার মনের গঠনের উপর। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একান্ত ব্যক্তিগত ছাড়া আর কিছু নয়। তবে একটা জিনিস সকলের মধ্যেই দেখা যায়। বড় একটা কিছু করতে গেলে জীবনে বিপ্লবের স্থান অপরিহার্য। এই বিপ্লবের দুটি দিক। প্রথমে সংশয়, তারপর পুনর্গঠনের চেষ্টা। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বিপ্লবকে সফল করে তুলতে হলে যে জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান করতেই হবে এমন নয়, কারণ এইসব সমস্যাকে আমরা সাধারণত সৃষ্টির মূল রহস্যের অঙ্গীভূত বলেই মনে করি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্যে জড়বাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদের উপর বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে ধর্মচর্চাটা ছিল নেহাতই ব্যবহারিক প্রয়োজনে। জীবনের প্রতিপদে যেসব দ্বিধা, যেসব সংশয় মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতো, সুচিন্তিত একটি জীবনদর্শন ছাড়া আর কিছুতেই তাদের জয় করা সম্ভব ছিল না। বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ আমাকে এই রকম একটি আদর্শের সন্ধান দিলেন। এই আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করার ফলে বহু সমস্যা, বহু সংকট

আমি সহজেই পার হয়ে এসেছি। অবিশ্যি তাই বলে মনে করবেন না সব সংশয়েরই চিরকালের জন্য অবসান ঘটেছিল। দুঃখের বিষয়, আমার মনকে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত করা কোনোকালেই সম্ভব হয়নি, হওয়ার কথাও নয়, কারণ সচেতনভাবে বাঁচতে হলেই পদে পদে সংশয় দেখা দেবে! মানুষের কাজই এই সংশয় জয় করা। অন্তর্দ্বন্দ্ব আমার মধ্যে সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল যৌনপ্রবৃত্তির ক্ষেত্রে। পার্থিব ভোগসুখ বর্জন করে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্তে পেঁছতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। এই রকম জীবনের উপযুক্ত করে শরীর মনকে গড়ে তুলতেও আমাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু গোলমাল বেধেছিল যৌনপ্রবৃত্তি দমন করার বেলায়—মানুষের স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তিকে দমন করা কি মুখের কথা! কী প্রাণান্তকর দ্বন্দ্ব যে আমার সারাজীবন ধরে চলেছে তা বোঝানো যায় না।

যৌনসম্ভোগ বর্জন তো বটেই, যৌনকামনা দমন করাও আমার মতে তেমন দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু আমাদের দেশের যোগীঋষিদের মতে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শুধু এই যথেষ্ট নয়। যে মানসিক আবেগ এবং সহজপ্রবৃত্তি থেকে যৌনকামনার উদ্ভব তাদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে সবরকম যৌন আকর্ষণের বিলুপ্তি ঘটে—শরীর মন যৌনচেতনার ঊর্ধ্বে ওঠে। কিন্তু এ কি কখনো সম্ভব, না এ শুধু কষ্টকল্পনা? রামকৃষ্ণ বলে গেছেন, এ সম্ভব, এবং শরীর মনকে এভাবে পবিত্র না করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমে পেঁছন যায় না। শোনা যায় অনেকেই রামকৃষ্ণের চরিত্রবল এবং আধ্যাত্মিক সিদ্ধি নানাভাবে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু যতবারই তাঁকে সুন্দরী স্ত্রীলোকদের মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেখা

গেছে নিষ্পাপ শিশুর মতোই তিনি তাদের প্রতি নির্বিকার, নিরাসক্ত ব্যবহার করেছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর মনে সম্পূর্ণ অযৌনপ্রকৃতির প্রতিক্রিয়া দেখা যেত। রামকৃষ্ণ সর্বদা বলতেন সাধনার পথে সবচেয়ে বড় বিঘ্ন হচ্ছে কামিনী এবং কাঞ্চন। রামকৃষ্ণের এই বাণী আমি ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম।

গোড়ার দিকে রামকৃষ্ণের উপদেশ অনুযায়ী চলতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল—যৌনপ্রবৃত্তি দমন করবার জন্য আমি যত বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতাম প্রবৃত্তির তীব্রতাও যেন ততই বেড়ে যেত। কতকগুলি যোগাসন এবং বিশেষ প্রক্রিয়ার ধ্যানের সাহায্যে যৌনসংযম আমার কাছে সহজসাধ্য হয়ে এসেছিল এবং আমি নিজেকে বেশ নিরাসক্ত করে এনেছিলাম। কিন্তু নিরাসক্তি বলতে রামকৃষ্ণ যাতে বিশ্বাস করতেন সে আমার কাছে একেবারে অসম্ভব বলে মনে হত। যাই হোক, হাল না ছেড়ে অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা করেছিলাম। কখনো আসত হতাশা, কখনো অনুশোচনা। সে সময়ে একবারও মনে হয়নি যে যৌনপ্রবৃত্তিটা মানুষের পক্ষে কতখানি স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণের আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে তখন আমি আজীবন ব্রহ্মচারী থাকবার সাধনায় রত।

মানুষের স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তিকে দমন করবার জন্য এত সময় ও শক্তির অপচয়ের কোনো সার্থকতা আছে কি না এ সম্বন্ধে আজকের দিনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে। কৈশোর এবং যৌবনে ব্রহ্মচর্য পালনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মতে যৌনচেতনাকে চিরকালের মতন সম্পূর্ণভাবে দমন করা উচিত। আমাদের শরীর ও মনের বল তো আর অপর্যাপ্ত নয়! এক্ষেত্রে যৌনপ্রবৃত্তি দমনের অসাধ্যসাধনে সময় ও শক্তির এত অপচয় সত্যিই

কি সমর্থনযোগ্য? আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যৌনপ্রবৃত্তি দমন কি একান্তই অপরিহার্য? দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক উন্নতির চাইতে জনসেবাই যার জীবনে বড় স্থান অধিকার করেছে তার পক্ষে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা কতখানি? এই দুটি প্রশ্নের জবাব যাই হোক না কেন, ১৯১৩ সালে আমি যখন কলেজে ঢুকলাম তখন আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যৌনপ্রবৃত্তি দমন একান্ত প্রয়োজন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে বেঁচে থাকারই কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু মনে মনে এই সংকল্প থাকলেও তাকে কার্যে পরিণত করা আমার পক্ষে তখনো সুদূরপরাহত ছিল।

জীবনটাকে গোড়ার থেকে যদি আবার শুরু করা যেত তবে বোধ হয় আমি কখনোই যৌনপ্রবৃত্তি দমনের প্রয়োজনীয়তাকে এতখানি বড় করে দেখতাম না। অবশ্য তাই বলে ভাববেন না আমি যা করেছিলাম তার জন্য অনুশোচনা করছি। যৌনপ্রবৃত্তি দমন করা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে যদি আমি ভুল করেও থাকি তবে সে আমার পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবনের সবরকম বাধাবিঘ্ন, দুঃখকষ্টের জন্য নিজেকে আমি প্রস্তুত করে তুলতে পেরেছিলাম।

পুরনো কথায় ফিরে আসা যাক। কলকাতায় আমি ভর্তি হলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সি ছিল সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কলেজ। গ্রীষ্মের বন্ধের পর কলেজ খোলবার তখনো তিনমাস বাকি। এই তিনমাস আমি বসে ছিলাম না। একবছর আগে কটকে যে ছেলেটির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল, তার দলটিকে খুঁজে বের করলাম। সাধারণত,

ষোলো বছরের একটি ছেলে যদি একা কলকাতার মতো বড় শহরে আসে তবে প্রথম প্রথম সে দিশা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আমার বেলা তা ঘটেনি—কলেজ খোলবার আগেই আমি কলকাতায় বেশ গুছিয়ে বসলাম, পছন্দমতো অনেক বন্ধুও জুটিয়ে ফেললাম।

কলেজে প্রথম কয়েকদিন ভারি মজায় কেটেছিল। যে কোনো বৃটিশ য়ুনিভার্সিটির চাইতে এদেশের কোনো য়ুনিভার্সিটির প্রবেশিকা পরীক্ষা অনেক সহজ বলে এদেশের ম্যাট্রিকুলেটরা ইংরেজ ছেলেদের চেয়ে একটু অল্প বয়সেই কলেজে ভরতি হয়। আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হলাম তখন আমার বয়স ষোলোর সামান্য উপরে, তবু কলেজে ঢোকবার সময়ে মনে হল আমি যেন বড়দের পর্যায়ে পেঁছে গেছি। অনুভূতিটা বেশ সুখকর সন্দেহ নেই। প্রথম কয়েকটা দিন নতুন বন্ধুত্ব পাতাতেই কেটে গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যারা উঁচু স্থান অধিকার করেছিল তাদের দেখবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হয়ে ছিল। মফঃস্বল থেকে আসার দরুন আমি গোড়ার দিকে একটু লাজুক ও মুখচোরা গোছের ছিলাম। কলকাতার হিন্দু এবং হেয়ার স্কুল জাতীয় আরো স্কুল থেকে কয়েকটি অত্যন্ত চালিয়াত এবং সবজান্তা ছেলে এসে আমাদের সঙ্গে ভরতি হয়েছিল। কিন্তু তাদের চালিয়াতি বেশিদিন টেকেনি, কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উঁচু স্থানগুলি বেশির ভাগই অধিকার করেছিল মফঃস্বলের ছাত্ররা, তাছাড়া আমরাও কিছুদিনের মধ্যেই শহুরে ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে শুরু করেছিলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই আমি সহপাঠীদের মধ্য থেকে আমার মতোই একদল ছেলে জুটিয়ে ফেললাম। আমাদের এই দলের সকলেই বাইরে বেশ একটু গোঁড়াভাব নিয়ে চলাফেরা করতাম বলে সহজেই লোকের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু লোকে কী ভাববে না ভাববে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতাম না। তখনকার দিনে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এরকম অনেক বিভিন্ন ধরনের দল দেখা যেত। রাজা ও ধনীর দুলাল এবং তাদের মোসাহেবদের নিয়ে এমনি একটি দল ছিল। এরা সেজেগুজে বেড়াত আর পড়া পড়া খেলত। আর একটি দল ছিল গ্রন্থকীটদের—পুরু কাচের চশমাপরা শান্তশিষ্ট, সুবোধসুশীল গোছের, এই ছেলেরা পড়া ছাড়া জগতে আর কিছুই জানত না। তৃতীয় একটি দলে ছিল অনেকটা আমাদের মতোই একদল পরম উৎসাহী ছেলে—নিজেদের তারা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মানসপুত্র বলেই বোধ হয় মনে করত। এই ক'টি দল ছাড়া একটি গুপ্ত বিপ্লবী দল ছিল। এদের সম্বন্ধে বেশির ভাগ ছেলেই বিশেষ কিছু জানত না। আজকের প্রেসিডেন্সির সঙ্গে সেযুগের প্রেসিডেন্সি কলেজের অনেক প্রভেদ ছিল। অধ্যাপকমণ্ডলীতে সে সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো মনীষীদের উপস্থিতি এর একটা কারণ। সরকারী কলেজ হলেও প্রেসিডেন্সির ছাত্ররা মোটেই সরকারভক্ত ছিল না। এর কারণ, লেখাপড়ায় ভালো হলেই যে-কোনো ছেলে প্রেসিডেন্সিতে ঢুকতে পারত। সি. আই. ডি. মহলে প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের অত্যন্ত বদনাম ছিল বলে শোনা যায়। ইডেন হিন্দু হস্টেলকে তো বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা বলে ধরা হত। এজন্য পুলিশ প্রায়ই এসে হস্টেল খানাতল্লাসী করে যেত। কলেজে প্রথম দুবছর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ভক্তদের প্রভাব আমার উপর খুব বেশি ছিল। দলের অধিকাংশই ছিল ছাত্র এবং এদের নেতা ছিল মেডিক্যাল কলেজের দুজন ছাত্র—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুগোলকিশোর আঢ্য। এরা রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের আদর্শকে

জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তবে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এরা জনসেবার উপরেই বেশি জোর দিত। জনসেবা বলতে এদের বিবেকানন্দের শিষ্যদের মতো হাসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করার উপরে বিশেষ আস্থা ছিল না—এদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নতি করা। এ ব্যাপারে এদের উপর খৃস্টান মিশনারিদের প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়। বিবেকানন্দের শিষ্যেরা অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা বিবেকানন্দের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। আমরা এই ত্রুটি সংশোধন করতে এগিয়ে গেলাম। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল ধর্ম এবং জাতীয়তার সমন্বয় ঘটানো—শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও। তখনকার দিনে কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় জাতীয়তাবাদ প্রায় অপরিহার্য ছিল।

১৯১৩ সালে যখন আমি কটক ছেড়ে আসি তখন পর্যন্ত আমার মনে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো ধারণাই জন্মায়নি। শুধু জনসেবা সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা আমার মনে ছিল, আর ছিল আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ। কলকাতায় এসে আমি ধীরে ধীরে সব বুঝতে শিখলাম। জানলাম জনসেবা যোগসাধনারই একটি অঙ্গ—এবং জনসেবার মধ্য দিয়েই দেশের উন্নতি সম্ভব। জনসেবা সম্বন্ধে আমাদের দলের ছেলেদের জ্ঞান এর বেশি তখনো অগ্রসর হয়নি—আমার মতোই তারা এ সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট ধারণার জন্য অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। যাই হোক, আমাদের দলের একটা খুব বড় গুণ ছিল—দলের ছেলেরা সকলেই ছিল অত্যন্ত চটপটে এবং কর্মঠ এবং এদের মধ্যে অনেকে ভালো ছাত্র হিসেবেও খুব নাম করেছিল। এই দলের কার্যকলাপ তিনটি ধারায় বিভক্ত

ছিল। প্রথমত, নতুন নতুন ভাবধারার সন্ধানে দর্শন, ইতিহাস এবং জাতীয়তাবাদের উপরে নতুন নতুন বই পড়া এবং এইভাবে যে জ্ঞান লাভ হত সেটা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় এবং বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন সভ্য সংগ্রহ করাও আমাদের অন্যতম কাজ ছিল, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বহুলোকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটেছিল। আমাদের তৃতীয় কাজ ছিল নামকরা লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা। যদি কোনো সাধু সন্ন্যাসীর কাছে সত্যের সন্ধান মেলে সেই আশায় বারাণসী, হরিদ্বার ইত্যাদি তীর্থস্থান পরিদর্শন করে ছুটির দিনগুলি কাটানো হত। অনেকে আবার দেশের প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধানে ঐতিহাসিক জায়গাগুলিতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করত। আমি একবার এমনি একটি দলের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম। সাতদিন ধরে পরিভ্রমণ করার ফলে প্রাক্-বৃটিশ যুগের বাঙলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য আমরা আবিষ্কার করেছিলাম—স্কুল-কলেজে মাসের পর মাস পড়লেও যা কখনোই সম্ভব হত না।

কতকগুলি সমস্যা তখনো পর্যন্ত আমরা ঠিকমতো সমাধান করে উঠতে পারিনি। পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী দাঁড়াবে বুঝতে পারছিলাম না। দলের নাম, আইনকানুন বা নির্দিষ্ট একটি কর্ম্মপন্থা তখনো ঠিক হয়নি। অনেক আলাপ আলোচনার পর ভেবেচিন্তে শেষটায় ঠিক হল, সত্যিকারের ভালো একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলবো। চতুর্দিকে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা থাকবে। দলের কয়েকজন এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এবং উত্তর ভারতের গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সমসাময়িক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শন করতে শুরু করল।

বেছে বেছে ভালো ছাত্রদের আমাদের দলভুক্ত করা হত, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানে ভালো অধ্যাপকের অভাব না হয়। দলের সকলেই আমরা ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়েছিলাম। দলের নেতৃস্থানীয়েরা সকলকে আগে থেকেই বলে দিতেন—এক সময়ে না এক সময়ে পরিবারের সঙ্গে বিরোধ ঘটবেই। তাই বলে অবিশ্যি গোড়ার থেকেই পরিবারের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নির্দেশ দেওয়া হত না। কিন্তু আমরা যেভাবে চলাফেরা করতাম তাতে পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রায় অনিবার্য ছিল। ছুটির দিনে প্রায়ই বাড়ি থাকতাম না, অভিভাবকদের অনুমতি নেবারও প্রয়োজন বোধ করতাম না। কখনো কখনো বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ বা ঐ জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে দল বেঁধে বেড়াতে যেতাম। কখনো নামকরা লোকদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম—১৯১৪ সালে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাই, সে সময়ে তিনি পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে আমাদের নানা উপদেশ দেন। কংগ্রেস তখনো পল্লীসংগঠনের কাজে হাত দেয়নি। আগেই বলেছি নানা জায়গায় আমাদের দলভুক্ত লোক ছিল। মাঝে মাঝে তাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসত। দু'একটা দিন তাদের সঙ্গে কাটিয়ে আসতাম। কলেজের বাইরে আমার বেশি সময়ই কাটত দলের ছেলেদের সঙ্গে। বাড়ির প্রতি আমার কোনো আকর্ষণই ছিল না—আমার আদর্শের সঙ্গে বাড়ির ধারার কোনো মিল খুঁজে পেতাম না। ঘর ও বাইরের এই দোটানায় পড়ে চিরকালই আমি বড় অশান্তি ভোগ করেছি। বিশেষ করে আমার আদর্শ বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে যখন বাড়িতে বিরূপ সমালোচনা হত মন বেদনায় ভরে উঠত।

রাজনীতির দিক থেকে আমাদের দল সবরকম সন্ত্রাসবাদী বা ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের বিপক্ষে ছিল। এজন্য ছাত্রমহলে আমরা

তেমন জনপ্রিয় ছিলাম না, কারণ তখনকার দিনে বাঙলাদেশের ছাত্রদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ছিল। এমন কি যেসব ছেলেরা এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী দলের ছায়া মাড়াতেও ভয় পেত তারাও মনে মনে সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করত। অনেক সময়ে নতুন সভ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে আমাদের দলের সংঘর্ষ লাগত। একবার বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। আমাদের কার্যকলাপ দেখে সি. আই. ডি.র কর্মকর্তাদের সন্দেহ হল ধর্মচর্চার ছদ্মবেশে আমরা হয়তো গোপনে অন্য কিছু করছি। এই সন্দেহে আমাদের দলের একটি সভ্যকে গ্রেপ্তার করার আয়োজন হল। সি. আই. ডি.র ধারণা ছিল এই সভ্যটিই দলের নেতা। এই সময়ে একটি সন্ত্রাসবাদী দলের দুজন সভ্যের চিঠিপত্র পুলিশের হাতে পড়ে—এই চিঠিগুলি থেকে পুলিশ জানতে পারে যে আমাদের দলের সেই সভ্যটিকে সন্ত্রাসবাদীরা পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার প্রস্তাব করছিল কারণ সে নাকি সন্ত্রাসবাদী দলের অনেক সভ্যকে আমাদের দলভুক্ত করে অহিংসা শিক্ষা দিচ্ছিল। এই চিঠি পড়ে আমাদের দলের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে পুলিশ সেই সভ্যটিকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে অব্যাহতি দেয়; আমাদেরও পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয়নি। ১৯১৩ সালে শীতের সময়ে আমরা কলকাতা থেকে ৫০ মাইল দূরে হুগলি নদীর ধারে অবস্থিত শান্তিপুর নামে একটি জায়গায় গিয়ে কিছুদিন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হয়ে বাস করছিলাম। হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে আমাদের আস্তানা খানাতল্লাসী করে সকলের নামধাম লিখে নিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটা এর বেশি আর গড়ায়নি।

তখনো আমি বি. এ. পাশ করিনি, সে সময়ে বাঙলাদেশের নেতাদের

মধ্যে অরবিন্দ ঘোষই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়—যদিও ১৯০৯ সাল থেকে তিনি স্বেচ্ছায় বাঙলাদেশ ছেড়ে বিদেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর নাম তখন লোকের মুখে মুখে। রাজনীতির জন্য তিনি জীবনের সবরকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের অন্য সব নেতাদের দৃষ্টি যখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের গণ্ডীতে আবদ্ধ, একমাত্র তিনিই তখন নির্ভয়ে পূর্ণস্বরাজের দাবি জানিয়েছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে বামপন্থী আদর্শ প্রচার করেছিলেন। হাসিমুখে তিনি কারাবাসও করেছিলেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে সারা ভারতেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকমান্য তিলক 'বড়দাদা' নামে পরিচিত ছিলেন এবং অরবিন্দ ছিলেন 'ছোটদাদা'। তিলক ছিলেন বামপন্থীদের নেতা। অরবিন্দর ছোটভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত। পুলিশ সন্দেহ করত বারীন্দ্রের সঙ্গে অরবিন্দের গোপন যোগাযোগ আছে—এ সম্পর্কে নানারকম জনশ্রুতিও ছিল। এর ফলে অরবিন্দের প্রতি দেশের যুবসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। তাছাড়া তাঁর মধ্যে রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার যে সমন্বয় ঘটেছিল তার জন্য ধর্মভাবাপন্ন লোকেদের কাছেও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯১৩ সালে আমি যখন কলকাতায় আসি তখনই দেশ অরবিন্দকে মহাপুরুষ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে উৎসাহ, যে প্রীতি দেখেছি সে রকম আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অরবিন্দ সম্বন্ধে সে সময়ে কত রকম জনশ্রুতি যে শোনা যেত তার ইয়ত্তা নেই, তার মধ্যে হয়তো কতক সত্যি, কতক মিথ্যা। একবার শুনলাম অরবিন্দ নাকি পেনসিল হাতে অর্ধ-সমাধিমগ্ন অবস্থায় নিজেরই সঙ্গে কথোপকথন লিপিবদ্ধ

করতেন—এইসব স্বগতোক্তিতে তিনি তাঁর দ্বিতীয় সত্তার নাম দিয়েছিলেন 'মানিক'। তাঁর বিচারের সময়ে পুলিশ অনেকগুলি কাগজপত্রে এই 'মানিকে'র সঙ্গে কথোপকথনের প্রতিলিপি পায়। যে পুলিশ প্রসিকিউটর এটি প্রথম আবিষ্কার করে সে যখন উত্তেজনায় অধীর হয়ে হঠাৎ একদিন কোর্টে দাঁড়িয়ে 'মানিক' নামধারী এই নবাবিষ্কৃত ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দাবি করেছিল সারা কোর্টে সেদিন হাসাহাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে সকলেই বলাবলি করত যে অরবিন্দ বারো বছরব্যাপী ধ্যান করার জন্যই পণ্ডিচেরী গিয়েছেন। বারো বছর পূর্ণ হলে তিনি গৌতম বুদ্ধের মতো সিদ্ধিলাভ করে দেশ উদ্ধার করতে আবার কর্মজীবনে ফিরে আসবেন। অনেকেই এই কথা বিশ্বাস করত। বিশেষ করে যারা ভাবত অলৌকিক শক্তি ছাড়া অন্য কোনোভাবে ইংরেজদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না তাদের কাছে এই কাহিনী তো প্রায় ধ্রুবসত্যের মতো ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হবার পর যখন প্রবল আন্দোলন শুরু হয় সে সময়ে অনেক অদ্ভুত গল্প শোনা যেত। চারদিকে রটে গেল ইংরেজদের সঙ্গে যেদিন আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে সেদিন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে একদল কম্বলধারী সন্ন্যাসী প্রবেশ করবেন। এই সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে ইংরেজ সৈন্যরা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকবে, আর বিনাবাধায় আমাদের হাতে ক্ষমতা চলে আসবে। এই ধরনের কত রকম অসম্ভব কল্পনা যে সে সময়ে আমাদের মাথায় ঘুরতো তার ঠিক নেই। কলেজে পড়বার সময়ে অরবিন্দর লেখা এবং চিঠিপত্র পড়ে তাঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সে সময়ে অরবিন্দ 'আর্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর আদর্শ প্রচার

করতেন। বাঙলাদেশের বিশিষ্ট কয়েকজন লোকের কাছে তিনি চিঠিপত্রও লিখতেন। এইসব চিঠি লোকের হাতে হাতে ঘুরত। রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের কাছে চিঠিগুলির বিশেষ মূল্য ছিল। আমাদের হাতেও মাঝে মাঝে এই চিঠি আসত। সকলকে সেইসব চিঠি পড়ে শোনান হত। একটি চিঠিতে অরবিন্দ লিখেছিলেন, "আমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎশক্তির এক একটি ডাইনামো হতে হবে, যাতে আমরা যখন উঠে দাঁড়াব তখন চারপাশে হাজার হাজার লোকের মধ্যে আলো ছড়িয়ে পড়ে—তারা স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে।" চিঠি পড়ে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম দেশের সেবা করতে হলে আধ্যাত্মিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি অরবিন্দর চমকপ্রদ এইসব বাণী আমাকে ততটা আকৃষ্ট করেনি যতখানি করেছিল তাঁর জীবন-দর্শন। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রভাব আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না, মনেপ্রাণে গ্রহণ করতেও বাধা ছিল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজছিলাম। একের সঙ্গে বহুর, ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতার যে বাণী রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ প্রচার করে গিয়েছিলেন তাতে আমার মন কিছুটা সংশয়মুক্ত হয়েছিল সত্যি, কিন্তু মায়াবাদের প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এই সময়ে অরবিন্দ এলেন মুক্তির বার্তা নিয়ে। তিনি শুধু জড় ও চৈতন্য, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, বিভিন্ন যোগের একটি সমন্বয়ের সাহায্যে পরমজ্ঞান লাভের পথও নির্দেশ করলেন। হাজার হাজার বছর আগে ভগবদ্গীতা যোগসাধনার বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছিল। এই বিভিন্ন পথ হল—জ্ঞানের মধ্য দিয়ে

আত্মোপলব্ধি বা জ্ঞানযোগ; ভক্তি এবং প্রেমের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি বা ভক্তিযোগ; এবং নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি বা কর্মযোগ। পরবর্তী কালে এদের সঙ্গে আরো দুটি মত যুক্ত হয়েছে—হঠযোগ এবং রাজযোগ। হঠযোগের উদ্দেশ্য শরীরকে সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনা, আর রাজযোগের উদ্দেশ্য শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে মনকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনা। বিবেকানন্দ বলতেন চরিত্র গঠন করতে জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম—তিনেরই প্রয়োজন। বিভিন্ন যোগের একটি সুষ্ঠু সমন্বয় কী করে হতে পারে সে সম্বন্ধে অরবিন্দর ধারণায় বেশ অভিনবত্ব ছিল। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন বিভিন্ন যোগের সাহায্যে কী ভাবে ধাপে ধাপে পরম সত্যে পৌঁছন যায়। বাঙলার তৎকালীন বৈষ্ণবদের কর্ম- এবং জ্ঞান-বিমুখতার তুলনায় অরবিন্দর এই নতুন দর্শন আমার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল—আমি যেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেলাম। অরবিন্দ শুধু যদি সে সময়ে কর্মজীবনে ফিরে আসতেন তবে বিনা দ্বিধায় তাঁকে মানবজাতির আদর্শ-গুরু বলে মেনে নিতাম।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তাঁকে এক সময়ে বাঙলার মুকুটহীন রাজা বলা হত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম। যতদূর মনে পড়ে ১৯১৩ সালের শেষে কিংবা ১৯১৪ সালের গোড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তাঁকে প্রথম দেখি। তখন পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতায় দেশ মুগ্ধ। সভার মধ্যেই তিনি প্রচুর টাকা তুলে ফেললেন। কিন্তু অত ভালো বক্তা হলেও সুরেন্দ্র-

নাথের মধ্যে সেই প্রাণস্পর্শ ছিল না যা অরবিন্দর অতি সাধারণ কথার মধ্যেও পাওয়া যেত: অরবিন্দ বলতেন, "আমি চাই তোমরা বড় হয়ে ওঠো, তোমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য নয়, স্বদেশের জন্য, যাতে জগতের অন্য সব স্বাধীন দেশের মাঝে ভারতবর্ষও সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। তোমাদের মধ্যে যারা দীনদরিদ্র, আমি চাই শত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও যেন তারা দেশের সেবা করতে না ভোলে। তোমাদের কাজের মধ্য দিয়েই দেশের উন্নতি, তোমাদের বেদনাতেই দেশের মুক্তি।"

যতদিন পর্যন্ত রাজনীতিতে আমার ঝোঁক যায়নি ততদিন দুটো জিনিস নিয়ে আমি মত্ত ছিলাম—প্রথমত, ধর্মপ্রচারক দেখলেই নির্বিচারে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা, দ্বিতীয়ত, জনসেবার শিক্ষানবিশী করা। কলকাতায় বোধ হয় এমন কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠান ছিল না যার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ না ছিল। জনসেবার ব্যাপারেও আমার বেশ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে সময়ে দক্ষিণ কলকাতায় অনাথ ভাণ্ডার নামে একটি দরিদ্র সেবা প্রতিষ্ঠান ছিল। জনসেবার উৎসাহে আমি এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের কাজ ছিল প্রতি রবিবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ এবং চালডাল সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা। এই কাজটা সাধারণত ছাত্রকর্মীদের উপরে দেওয়া হত। আমি এদের দলে ভিড়ে ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগলাম। সাধারণত চালটাই পাওয়া যেত। নিয়ম ছিল দিনের শেষে প্রত্যেককে অন্তত একমন থেকে দুমন পর্যন্ত চাল এনে দিতে হবে। প্রথম যেদিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরোলাম, এ ধরনের কাজে অনভ্যস্ততার দরুন লজ্জায় আমার প্রায় মাথা কাটা যাবার উপক্রম হয়েছিল। আমার এই ভিক্ষা করে বেড়ানোর

কথা আজও বোধ হয় বাড়ির কেউ জানে না। বহুদিন পর্যন্ত এই লজ্জা আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি—যখনই চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয় থাকতো ভিক্ষার ঝুলিটা কাঁধে ফেলে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে সটান এগিয়ে যেতাম।

কলেজে আমি পড়াশোনায় ফাঁকি দিতে শুরু করলাম। অধ্যাপকদের কাউকেই আমার ভালো লাগত না, তাঁদের পড়ানোতে কোনো রস পেতাম না। ক্লাসে অধ্যাপকের পড়ানোয় মন না দিয়ে বসে বসে ভাবতাম—লেখাপড়া করে কী লাভ? সবচেয়ে বিরক্ত লাগত অঙ্কের অধ্যাপকের একঘেয়ে বক্তৃতা। তাঁর কোনো কথা আমার কানে যেত না, গেলেও তার মানে বুঝতাম না। কলেজ-জীবনের এই একঘেয়েমি কাটাবার জন্য আমি জনহিতকর নানা কাজে মেতে থাকতাম। খেলাধুলায় আমার উৎসাহ ছিল না, আগেই বলেছি। আমার দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে। নিজের থেকেই আমি বিখ্যাত রসায়নবিদ্ অধ্যাপক স্যর পি. সি. রায়ের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। পি. সি. রায় অবিশ্যি আমাদের পড়াতেন না, কিন্তু তাঁর মহানুভবতার জন্য ছাত্র মহলে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, বন্যা বা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য টাকা তোলা, ছাত্রদের প্রতিনিধি হয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, সহপাঠীদের নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাওয়া—এই ধরনের কাজ আমার খুব ভালো লাগত। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আত্মকেন্দ্রিকতা কাটিয়ে উঠে আমি বেশ সামাজিক হয়ে উঠলাম—মন থেকে যোগের প্রভাবও কেটে যেতে লাগল।

ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় মাঝে মাঝে মনের বিশেষ কোনো দুর্বল মুহূর্তে তুচ্ছতম ঘটনাও আমাদের জীবনকে কী ভাবে

প্রভাবান্বিত করে। কলকাতায় আমাদের বাড়ির সামনে প্রতিদিনই একটি বুড়ি ভিক্ষা করতে বসত। বাড়িতে ঢুকতে বা বাড়ি থেকে বেরোতে সর্বদাই ভিখিরীটি চোখে পড়ত। পরনে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, সেই বৃদ্ধার বেদনাক্লিষ্ট চেহারাটা যতবারই দেখতাম, যতবারই ওর কথা ভাবতাম বেদনায় আমার মন ভরে যেত। ওর অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখে নিজেকে কেমন যেন দোষী দোষী মনে হত। মনে প্রশ্ন জাগত—আমি তিনতলা বাড়িতে বসে আরামে দিন কাটাচ্ছি, আর এই বেচারীর না আছে খাওয়াপরার সংস্থান, না আছে মাথা গোঁজবার ঠাঁই—এ কি অবিচার নয়? জগতে যদি দুঃখদারিদ্র্য নাই ঘুচল, তবে যোগের সার্থকতা কি? এইসব কথা ভাবলে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহ করে উঠত। কিন্তু আমি কিই বা করতে পারতাম? সমাজব্যবস্থা বদলানো তো একদিনের কর্ম নয়। যাই হোক, যতদিন তা না হচ্ছে, এই দুঃখিনীর একটা উপায় করা দরকার। কলেজে যাতায়াতের জন্য ট্রামভাড়া বাবদ আমি যে পয়সা পেতাম, ঠিক করলাম এবার থেকে সেই পয়সা জমিয়ে গরিব দুঃখীদের দান করব। বাড়ি থেকে কলেজ প্রায় তিন মাইল দূর—প্রায়ই হেঁটে বাড়ি ফিরতাম, হাতে সময় থাকলে কখনো কখনো যেতামও হেঁটে। এতে বিবেকের দংশন থেকে খানিকটা মুক্তি পেয়েছিলাম।

কলেজে প্রথম বছর ছুটিতে বাবা-মার কাছে কটকে ফিরে গেলাম। এবার আর আমার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে কোনো বাধা দিলেন না বাবা-মা, কারণ আমার কলকাতার কার্যকলাপের কথা তাঁদের অজানা ছিল না। কটকে থাকতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যথেষ্ট ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরিনি, এমন কখনো হয়নি।

কলকাতায় রাতের পর রাত বাইরে কাটিয়েছি—অভিভাবকদের অনুমতি নেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি। কটকে ফিরে আমি নিজেকে শুধরে নিলাম। একবার বাবা-মা কটকের বাইরে কোথায় গিয়েছেন, কয়েকজন বন্ধু এসে জানাল কাছেই একটি গ্রামে কলেরা লেগেছে, সেখানে শুশ্রূষা করতে যেতে হবে। আমাদের দলে কোনো ডাক্তার ছিল না। শুধু আধা-ডাক্তার গোছের একজন ছিল। থাকবার মধ্যে তার ছিল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার একটি বই, এক বাক্স হোমিওপ্যাথি ওষুধ আর ছিল প্রচুর সাধারণজ্ঞান। আমি তখুনি রাজী হয়ে গেলাম। বাবার অবর্তমানে কাকা ছিলেন আমার অভিভাবক, তাঁকে বললাম কয়েকদিনের জন্য একটু বেড়াতে যাচ্ছি। আমি যে কলেরার রোগীর শুশ্রূষা করতে যাচ্ছি তিনি টের পাননি, কাজেই সহজেই মত দিলেন। আমি সপ্তাহখানেক মাত্র বাইরে ছিলাম, কারণ আমাদের যাবার কয়েকদিন পরেই কাকা আমাদের আসল উদ্দেশ্য জানতে পেরে আমার আর এক কাকাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। বহু খোঁজাখুঁজি করে তবে তাঁরা আমাদের নাগাল পেয়েছিলেন।

তখনকার দিনে লোকে বিশ্বাস করতে চাইত না যে কলেরা সারানো যায়। কাজেই কলেরার রোগীর শুশ্রূষা করতে সহজে কেউ এগিয়ে আসত না। এদিক থেকে আমাদের দলটি ছিল সম্পূর্ণ ভয়শূন্য। বলতে গেলে কলেরার ছোঁয়াচ এড়াবার জন্য আমরা কোনো রকম সাবধানতাই অবলম্বন করিনি—এক সঙ্গেই সবাই থাকতাম, খেতাম। রোগের চিকিৎসা আমরা সামান্যই করতে পেরেছিলাম। আমরা পেঁৗছবার আগেই অনেক রোগী মারা গিয়েছিল এবং যাদের আমরা শুশ্রূষা করেছিলাম তাদের মধ্যেও বেশির ভাগই বাঁচেনি। যাই হোক,

এক সপ্তাহে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তাতে ভারতের সত্যিকার রূপটি আমার চোখে ধরা পড়েছিল যে, ভারতের গ্রামে গ্রামে শুধু নিদারুণ দারিদ্র্য, মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা, আর নিরক্ষরতার অভিশাপ। সঙ্গে আমাদের জামাকাপড় বা বিছানাপত্র বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, কারণ বহুদূর পথ পায়ে হেঁটে আমাদের পার হতে হত। পথে যা পেতাম তাই খেতাম, যেখানে হোক কোনোরকমে মাথা গুঁজে রাত কাটাতাম। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল যখন দেখলাম গ্রামের লোকেরা আমাদের সহজভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি। সরকারী লোক যে আমরা নই সেটা তারা বুঝেছিল, কারণ সরকারী কর্মচারীরা কস্মিনকালেও তাদের অসুখ-বিসুখে শুশ্রূষা করতে এগিয়ে আসেনি। শহরের ধনী লোকেরাও তাদের সম্বন্ধে কখনো মাথা ঘামায়নি। গ্রামের লোকেরা শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করল, নাম কেনাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই ধারণা আমরা কোনোমতেই তাদের মন থেকে দূর করতে পারিনি।

কলকাতায় ফিরে এসে আবার সাধুসন্ন্যাসীদের নিয়ে মেতে উঠলাম। কলকাতা থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে একটি ছোট শহরে নদীর ধারে পাঞ্জাব থেকে আগত এক তরুণ সন্ন্যাসী বাস করতেন। আমার বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে নিয়ে সুযোগ পেলেই আমি তাঁর কাছে যেতাম। সন্ন্যাসীটি কখনো কারুর বাড়িতে যেতে চাইতেন না। তাঁর আদর্শ ছিল বোধ হয়—

আকাশটা ছাদ, ঘাসের বিছানা শয্যা;
ভাগ্যে যা জোটে, তাই দিয়ে রোজ উদরের পরিচর্যা।

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম এই তরুণ সন্ন্যাসী কী ভাবে পার্থিব ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষা এবং শীতগ্রীষ্মানুভূতি সম্পূর্ণ জয় করেছেন। দুপুরবেলা প্রচণ্ড রোদ্দুরের মধ্যে তিনি পঞ্চাগ্নি জ্বালিয়ে তার মাঝখানে বসে ধ্যান করতেন। রাত্রিবেলা নাকি অনেক সময়ে তাঁর গায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যেত, কিন্তু তাতে তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হত না। তাঁর নির্মল চরিত্র এবং স্নেহশীলতা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তিনি কখনো কারুর কাছে কিছু চাইতেন না, লোকেরা নিজের থেকেই দলে দলে এসে তাঁকে খাদ্যবস্ত্র দিয়ে যেত। ঠিক যতটুকু তাঁর প্রয়োজন তার বেশি তিনি কখনো গ্রহণ করতেন না। তাঁর দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে সি. আই. ডি.র লোকও ছিল—তারা অনুসন্ধান করত সন্ন্যাসী বাস্তবিকই নিরীহ কি না। তিনি যদি আর একটু মননশীল হতেন তবে সারাজীবনের জন্যই হয়তো আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতাম। এই তরুণ তপস্বীর সংস্পর্শে আসবার পর থেকে আমার মনে কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল। ১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার বন্ধু হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় খরচের জন্য এক সহপাঠীর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিলাম। বন্ধুটি তার স্কলারশিপের টাকা থেকে আমাকে ধার দিয়েছিল, আমিও পরে আমার স্কলারশিপ থেকেই এই ধার শোধ দিই। বলা বাহুল্য, বেরিয়েছিলাম বাড়িতে কাউকে না জানিয়েই, পরে পোস্টকার্ডে দু লাইন লিখে খবরটা দিয়েছিলাম। লছমন-ঝোলা, হৃষীকেশ, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি উত্তর ভারতের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব ক'টি তীর্থেই আমরা গিয়েছিলাম। হরিদ্বারে আমাদের আর একটি বন্ধু এসে দলে ভিড়ে পড়ল।

তীর্থ দর্শনের ফাঁকে আমরা দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি ঐতিহাসিক জায়গাগুলিও দেখে নিয়েছিলাম। সব জায়গাতেই সাধুসন্ন্যাসী যতজনের সঙ্গে পেরেছি দেখা করেছি। এ ছাড়া কয়েকটি আশ্রম এবং গুরুকুল ও ঋষিকুল বিদ্যায়তনও পরিদর্শন করেছিলাম। শেষোক্ত বিদ্যায়তন দুটি প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে পরিকল্পিত। এদের মধ্যে গুরুকুলই একটু সংস্কারপন্থী, বিশেষ করে জাতিভেদের ক্ষেত্রে। হরিদ্বারের একটি আশ্রমে আমাদের বেশ মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। আশ্রমবাসীরা আমাদের সহজভাবে গ্রহণ করতে ইতস্তত করছিলেন, কারণ তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না আমরা বাস্তবিকই ধর্মভাবাপন্ন, না ধর্মের ছদ্মবেশে একদল বিপ্লববাদী বাঙালী যুবক। দুমাস ধরে এইভাবে তীর্থে তীর্থে ঘুরে অনেক ধার্মিক পুরুষের দেখা পেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দু সমাজব্যবস্থার মূল গলদগুলিও আমার কাছে ধরা পড়েছিল। সাধুসন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারে বদলে গিয়েছিল। প্রথম আমার চোখ খোলে যেবার হরিদ্বারের একটি ভোজনালয়ে আমাদের খেতে দিতে আপত্তি জানালো। বাঙালীরা মাছ খায়, কাজেই তারা খৃস্টানদের মতোই অপবিত্র—অতএব ভোজনালয়ে আর সকলের সঙ্গে বসে খাবার অধিকার তাদের নেই। আমাদের নিজের নিজের বাসনে ভোজনালয় থেকে খাবার নিয়ে এসে নিজেদের ঘরে বসে খেতে হত। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল ব্রাহ্মণ, কিন্তু সেও এই ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। বুদ্ধগয়ায়ও একই ব্যাপার। বারাণসীর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের পরিচয়পত্র নিয়ে আমরা একটি মঠে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। খাওয়ার সময়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হল আমরা আলাদা আলাদা বসে খাবো কি না, কারণ আমরা সকলে

একজাতের ছিলাম না। প্রশ্ন শুনে আমি তো অবাক, কারণ এরা সকলেই ছিল শঙ্করাচার্যের ভক্ত। আমি চট্ করে শঙ্করাচার্যের একটি শ্লোক আউড়ে তাদের বুঝিয়ে দিলাম শঙ্করাচার্য নিজে সবরকম ভেদাভেদের একান্ত বিপক্ষে ছিলেন। হাতে হাতে যুক্তি পেয়ে আমার কথায় তারা প্রতিবাদ করতে পারল না। কিন্তু পরের দিন যখন আমরা কুয়োর ধারে স্নান করতে গিয়েছি, কয়েকটি লোক এসে বলে গেল আমরা কুয়ো থেকে জল তুলতে পারবো না, কারণ আমরা ব্রাহ্মণ নই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ব্রাহ্মণ বন্ধুটির গলায় সে সময়ে পৈতে ছিল। সে তো সুযোগ বুঝে চাদরের তলা থেকে সেই পৈতে বের করে তাদের দেখিয়ে জল তুলে এক এক করে আমাদের দিতে শুরু করে দিল। বেচারাদের তখন যা অবস্থা!

মথুরায় আমরা এক পাণ্ডার বাড়িতে উঠেছিলাম। একদিন সেখান থেকে নদীর ওপারে এক সাধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সাধুটি মাটির তলায় একটি ঘরে থাকতেন। তিনি আমাদের সংসার ত্যাগ করার মতলব ছেড়ে বাড়ি ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন। একজন সন্ন্যাসী যে এই পরামর্শ কী করে দিতে পারে, ভেবে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম আমি, এখনো মনে পড়ে। মথুরায় থাকতে একজন আর্যসমাজীর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের নিকট-প্রতিবেশী। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী। আর্যসমাজীদের উদ্দেশ্য খাঁটি বৈদিক অনুশাসন অনুসারে হিন্দুধর্ম এবং সমাজব্যবস্থার সংস্কার করা। তাঁরা মূর্তিপূজা বা জাতিভেদ বিশ্বাস করেন না। এদিক থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে এদের মিল আছে। আর্যসমাজের প্রভাব সবচেয়ে বেশি

পাঞ্জাবে এবং যুক্তপ্রদেশে। আর্যসমাজের লোকের সঙ্গে আমাদের এত মেলামেশা করতে দেখে পান্ডা মহারাজ তো খেপে অস্থির। আমাদের সাবধান করে দিলেন, আর্যসমাজের লোকেরা মূর্তিপূজা মানে না, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।
মথুরায় বাঁদরের উৎপাতে টেঁকা দায় ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও যদি দরজা কিংবা জানালা খোলা থাকত হতভাগাগুলি ভিতরে ঢুকে যা পেত নিয়ে যেত কিংবা ভেঙে ছিঁড়ে তচ্‌নচ্‌ করত। মথুরা থেকে বেরিয়ে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এরপর গেলাম বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে পেঁছিন মাত্র পান্ডারা এসে আমাদের ছেঁকে ধরল। তাদের এড়াবার জন্য বললাম, আমরা গুরুকুল বিদ্যালয় দেখতে এসেছি। এতে ফল হল কারণ, শোনা মাত্র তারা কানে আঙুল দিয়ে বলল আমাদের সেখানে যাওয়া মোটেই উচিত নয়, কোনো হিন্দু সেখানে যায় না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাদের কবল থেকে ছাড়া পাওয়া গেল।

বৃন্দাবন থেকে কয়েক মাইল দূরে কুসুম সরোবর নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে ছোটো ছোটো কুঁড়েঘরে একদল বৈষ্ণবসাধক বাস করতেন। গাছপালা ঘেরা এই কুটিরগুলির আশেপাশে হরিণ, ময়ূর ইত্যাদি ঘুরে বেড়াত। ধর্মচর্চার পক্ষে জায়গাটা বাস্তবিকই অতি চমৎকার। আমরা ওখানে খুব আদরযত্নে কয়েকটা দিন কাটিয়ে এলাম। আখড়ায় মৌনীবাবা বলে একজন সাধক ছিলেন—তিনি দশ বছর যাবৎ মৌনব্রত পালন করছিলেন। আখড়ার অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণদাস বাবাজী ছিলেন হিন্দুশাস্ত্রে একজন সুপন্ডিত, তিনি বললেন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের চেয়ে বৈষ্ণব দ্বৈতাদ্বৈতবাদ উন্নততর।

সে সময়ে শঙ্করাচার্যের মতবাদকেই হিন্দুশাস্ত্রের সারবস্তু বলে আমি জানতাম। অবশ্য শঙ্করাচার্যের আদর্শকে নিজের জীবনে অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনাদর্শই এক্ষেত্রে আমার কাছে অনেক সহজ এবং বাস্তবপন্থী বলে মনে হত। যাই হোক, শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা শুনে আমি মোটেই খুশি হতে পারলাম না। তবু, যে কটা দিন কুসুমপুরে ছিলাম বেশ আনন্দেই কেটেছিল। বাবাজীদের সকলকেই আমার খুব ভালো লেগেছিল।

বারাণসীতে রামকৃষ্ণমিশন মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের সানন্দ অভ্যর্থনা জানালেন। স্বামীজী বাবাকে এবং আমাদের পরিবারের আরো অনেককেই ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। এখানে আমরা কয়েকদিন রইলাম। এদিকে বাড়িতে তখন হুলস্থুল লেগে গেছে। আমার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করে করে বাবা-মা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। আমার কাকা দাদারাও একটা কিছু করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু কী করবেন তাঁরা? পুলিশে খবর দেওয়াটা তাঁদের মনঃপূত হল না, কারণ পুলিশ এসব ব্যাপারে সাহায্য করার চেয়ে নাজেহাল করে বেশি। শেষটায় তাঁরা এক গণৎকারের শরণাপন্ন হলেন। গণৎকার গণনা করে বললেন, আমি সুস্থ শরীরে কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমে কোনো জায়গায় আছি, জায়গাটির নামের আদ্যাক্ষর 'ব'। তৎক্ষণাৎ সাব্যস্ত হল, জায়গাটি নিশ্চয়ই বৈদ্যনাথ—বৈদ্যনাথে একজন নামকরা যোগীর আশ্রম ছিল। আমার এক কাকা তখনই ছুটলেন বৈদ্যনাথ। কিন্তু তাঁর ছোটাছুটিই সার হল, কারণ আমি তখন বসে আছি বারাণসীতে।

হঠাৎ একদিন সবাইকে চমকে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম বলে আমার মনে কোনো রকম অনুশোচনা ছিল না, কিন্তু যে জন্য বেরিয়েছিলাম সেই গুরুই পেলাম না, কাজেই একটু মুশড়ে পড়েছিলাম। গুরুর সন্ধানে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানোর ফল হাতে হাতে পেলাম। কয়েকদিন পরেই টাইফয়েডে শয্যা নিতে হল। স্বাস্থ্যবিধির কাছে ধর্মের জারিজুরি খাটলো না। আমি যখন এইভাবে বিছানায় পড়ে আছি য়ুরোপে মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ (২)

কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া সে সময়ে বেশ গরম ছিল, তার উপরে সন্ত্রাসবাদীরাও ভিতরে ভিতরে ছাত্রদের মধ্যে খুব প্রচারকার্য চালাচ্ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিশেষ কয়েকটা ঘটনা না ঘটলে আমার রাজনৈতিক মতামত যে কোনদিকে মোড় নিত জানি না। কলেজে ও হস্টেলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কয়েকজন নেতার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত—এরা যে সন্ত্রাসবাদী সে খবর অবশ্য আমি পরে পেয়েছিলাম। যাই হোক, এদের মতবাদ আমাকে কখনো আকৃষ্ট করেনি—এর কারণ এই নয় যে আমি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসবাদে বিশ্বাস করতাম, আসল কারণ—তখন আমি নিজের সৃষ্ট এক জগতে বিচরণ করছিলাম এবং বিশ্বাস করতাম একমাত্র জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনঃসংগঠনের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা আসবে। অবশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে স্বাধীনতা কী ভাবে আসতে পারে আমাদের দলের কারুরই সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ইংরেজদের হাতে দেশরক্ষার ভার দিয়ে নিজেরা আভ্যন্তরীণ শাসনভার চালালে কেমন হয়—এ প্রস্তাবও আমরা এক সময়ে আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেছি।

দুটো ব্যাপার পরোক্ষে আমাকে নিজস্ব একটি রাজনৈতিক মতামত.

গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল—কলকাতার শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহারে এবং মহাযুদ্ধ।

১৯০৯ সালে জানুয়ারি মাসে পি. ই. স্কুল ছাড়বার পর থেকে ইংরেজদের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়টুকুর মধ্যে স্কুলের পরিদর্শক বা ঐজাতীয় দু-একজন সরকারী কর্মচারী ছাড়া ইংরেজ খুব কমই আমার চোখে পড়েছে। কটক শহরেও ইংরেজ বেশি দেখা যেত না, কারণ কটকে ইংরেজের সংখ্যাই ছিল অতি অল্প, তার উপরে তারা থাকতোও শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু কলকাতায় এসে ঠিক এর উল্টো ব্যাপার হল। প্রতিদিন কলেজে যেতে এবং কলেজ থেকে ফিরতে সাহেবপাড়ার মধ্য দিয়ে আমাকে যাতায়াত করতে হত। ট্রামগাড়িতে প্রায়ই নানারকম অপ্রিয় ব্যাপার ঘটত। ইংরেজরা ভারতীয়দের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত। কখনো কখনো দেখা যেত ইংরেজযাত্রীদের সামনের সীটে ভারতীয় বসে থাকলে নির্বিকারচিত্তে তারা সেই সীটে জুতো শুদ্ধ পা তুলে দিয়েছে, ভারতীয় যাত্রীটির গায়ে হয়তো জুতো ঠেকত, কিন্তু তাতে ইংরেজদের কোনো ভ্রূক্ষেপই ছিল না। অনেক ভারতীয় বিশেষ করে গরিব কেরানীর দল এসব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যেত, কিন্তু সকলের পক্ষে তা সম্ভব হত না। আমি তো এসব একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না। ট্রামে যেতে প্রায়ই ইংরেজদের সঙ্গে আমার বচসা লাগত। ক্বচিৎ কখনো সাহেবদের সঙ্গে ভারতীয়দের মারামারি করতে দেখা যেত। রাস্তায়ও একই ব্যাপার ঘটত। ইংরেজরা চাইত তাদের দেখলেই ভারতীয়েরা যেন পথ ছেড়ে দেয়, না ছাড়লে ধাক্কা দিয়ে, ঘুষি মেরে তাদের পথ থেকে সরিয়ে দিত। ইংরেজ সৈন্যগুলি ছিল আর এক

কাঠি সরেস—বিশেষ করে গর্ডন হাইল্যান্ডারগুলির তো কথাই নেই। আত্মসম্মান বজায় রেখে রেলে যাতায়াত করাও ভারতীয়দের পক্ষে বেশ কঠিন ছিল। রেলকর্তৃপক্ষ বা পুলিশ এসব ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কোনোরকম সাহায্যই করত না, কারণ, দেখা যেত তারা নিজেরাই হয়তো ইংরেজ কিংবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ভারতীয় কর্মচারীরা আবার উপরওয়ালার কাছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে ভয় পেত। কটকের একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমি তখন খুব ছোটো। আমার এক কাকার কোথায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি স্টেশন থেকে ফিরে এলেন, কারণ উচু শ্রেণীর কামরাগুলিতে কতকগুলি ইংরেজ ছিল, তারা ভারতীয়দের কোনোমতেই সেই কামরায় ঢুকতে দিতে রাজী হয়নি। রেলে এই ধরনের ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে উচ্চপদস্থ ভারতীয়দের প্রায়ই ঝগড়া লাগত বলে শোনা যেত। এইসব কাহিনী স্বভাবতই লোকের মুখে মুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত।

যখনই এই জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটত, আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে, শঙ্করাচার্যের মায়াবাদে তখন আর সান্ত্বনা খুঁজে পেতাম না। বিদেশীর হাতে অপমানিত হয়ে তাকে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া আমার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব হয়নি। কলেজে কোনো ইংরেজ অধ্যাপক যদি আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন আমার মেজাজ সাংঘাতিক বিগড়ে যেত। দুঃখের বিষয় এ রকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটত। আমাদের আগের যুগে অনেক ইংরেজ অধ্যাপককেই এজন্য ছাত্রদের হাতে মার খেতে হয়েছে। কলেজে প্রথম বছর আমারও এই জাতীয় অভিজ্ঞতা কয়েকবার হয়েছিল, তবে সে তেমন গুরুতর নয়। অবশ্য মেজাজ বিগড়ে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল।

ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ লাগলে আইনের দিক থেকে ভারতীয়রা কখনো সুবিচার পেত না। এর ফলে শেষটায় অন্য কোনো উপায় না দেখে তারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দিল। রাস্তায়, ট্রামে, রেলে তারা ইংরেজদের অত্যাচার অবিচার আর মুখ বুজে সহ্য করত না। মনে পড়ে আমাদের কলেজের একটি ছেলে ভালো বক্সিং জানত, সে সেধে সেধে সাহেবপাড়ায় গিয়ে টমিদের সঙ্গে মারামারি করে আসত। ভারতীয়দের এই পরিবর্তিত মনোভাবের ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। ইংরেজরা ভারতীয়দের সমীহ করে চলতে শুরু করল। লোকে বলাবলি করতে লাগল ইংরেজরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। এই মনোভাবই বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভিত্তি। উপরোক্ত ঘটনাগুলি স্বভাবতই আমার রাজনৈতিক চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিল, কিন্তু তখনো আমার মনে সঠিক কোনো মত গড়ে ওঠেনি। এজন্য মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার দরকার ছিল।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি। কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ি। আর যোগীঋষিদের সম্বন্ধে আমার নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা ভাবি। এ অবস্থায় আমার নিজের এতদিনের সব ধারণা এবং প্রচলিত মতবাদগুলি ভালো করে খতিয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম। নিজের মনকে প্রশ্ন করলাম—দেশের শাসনভার দুভাগে ভাগ করে, এক ভাগ বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, আর এক ভাগ নিজেদের হাতে রাখা—এ কি সম্ভব? না, আমাদের কর্তব্য শাসনভার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে রাখা, কিংবা সম্পূর্ণ অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া? এ প্রশ্নের জবাবের জন্য আমাকে বিশেষ ভাবতে হয়নি। ভারতবর্ষকে যদি অন্য সব সভ্যদেশের সমকক্ষ হতে হয় তবে তাকে তার মূল্যও বহন করতে হবে, দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব এড়িয়ে

গেলে চলবে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন, সামরিক অসামরিক দু রকম শাসনভারের জন্যই তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে। স্বাধীনতাকে কখনো ভাগ করা চলে না, স্বাধীনতার অর্থই হল বিদেশী শাসনের হাত থেকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। মহাযুদ্ধে আমরা দেখেছি সামরিক শক্তি না থাকলে যে কোনো দেশের পক্ষেই স্বাধীনতা বজায় রাখা কঠিন।

অসুখ থেকে সেরে উঠে আমি আবার আমার কাজকর্ম শুরু করে দিলাম। আগের মতো বন্ধুদের সঙ্গেই বেশির ভাগ সময় কাটাতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। সভ্যসংখ্যা এবং কাজকর্মের দিক থেকে আমাদের দলের দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল। দলের বিশিষ্ট সভ্য উদীয়মান একটি ডাক্তারকে (যুগলকিশোর আঢ্য) বিলেতে পাঠানো হল, যাতে বিলেত থেকে ফিরে এসে সে দলের এবং দেশের সত্যিকারের সেবা করতে পারে। আমাদের এই প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি, কারণ ডাক্তারটি বিলেতে একটি ফরাসী মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই চিরকালের জন্য থেকে গিয়েছিলেন। যাই হোক, যার যথাসাধ্য ডাক্তারকে বিলেতে পাঠাবার জন্য দিল, আমিও আমার স্কলারশিপের খানিকটা দিলাম। দলের আর একজনও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস-এ নাম লেখাল। আমরা সকলেই ভাবলাম যুদ্ধে গেলে ওর অভিজ্ঞতা তো বাড়বেই, উপরন্তু কিছু টাকা হাতে আসবে।

দুটো বছর নানারকম উত্তেজনার মধ্য দিয়েই কেটে গেল, পড়াশোনা মাথায় উঠল। ১৯১৫ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় যদিও আমি প্রথম বিভাগেই পাশ করলাম আমার স্থান ছিল একেবারে নিচের

দিকে। ক্ষণেকের জন্য আমার মনে একটু অনুশোচনা দেখা দিল, ঠিক করলাম বি. এ.তে ভালো ফল করতেই হবে।

বি. এ.তে দর্শনে অনার্স নিলাম—আমার বহুকালের ইচ্ছা এইবার পূর্ণ হল। লেখাপড়ায় এবার সত্যিই খুব মনোযোগ দিলাম। আমার কলেজ-জীবনে এই বোধ হয় প্রথম পড়ায় রস পেলাম। দর্শন পড়ে আমি যা লাভ করলাম তার সঙ্গে দর্শন সম্বন্ধে আমার ছোটোবেলার ধারণার কোনো মিল ছিল না। স্কুলে পড়বার সময়ে ভাবতাম দর্শন পড়লে জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। দর্শন অধ্যয়নকে সে সময়ে আমার কাছে এক ধরনের যৌগিক প্রক্রিয়া বলেই মনে হত। দর্শন পড়ার ফলে কোনোরকম তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করলেও আমার মনন-ক্ষমতা আগের চাইতে বেড়ে গেল, সব কিছুই বিচার করে দেখতে শুরু করলাম। পাশ্চাত্য দর্শনের গোড়ার কথাই সংশয়বাদ—কেউ কেউ বলেন এর শেষও সংশয়ে। পাশ্চাত্য দর্শন কোনো কিছুকেই নির্বিবাদে গ্রহণ করতে রাজী নয়—যুক্তিতর্কের সাহায্যে তার দোষগুণ বিচার করে তবে গ্রহণ করে—এক কথায়, মনকে সংস্কারমুক্ত করে। এতকাল বেদান্তকে অভ্রান্ত বলে মেনে এসেছি, এখন মনে প্রশ্ন জাগল, বাস্তবিকই বেদান্ত অভ্রান্ত কি না। মননচর্চার খাতিরে জড়বাদের স্বপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই দলের অন্য সকলের সঙ্গে আমার বিরোধ লাগল। এই প্রথম আমার খেয়াল হল ওরা কতখানি গোঁড়া ও সংস্কারাচ্ছন্ন। অনেক জিনিসই ওরা নির্বিবাদে মেনে নেয়—কিন্তু যে সত্যিকারের সংস্কারমুক্ত সে কখনোই ভালো করে যাচাই না করে কোনো জিনিসকে সত্য বলে মানবে না।

প্রচুর উৎসাহ নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম, হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল।

১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাস তখন। সকালে কলেজ লাইব্রেরিতে বসে পড়ছি এমন সময়ে খবর পেলাম জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে মারধোর করেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আমাদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিঃ ওটেনের ঘরের সামনের বারান্দায় পায়চারি করছিল, এতে বিরক্ত হয়ে মিঃ ওটেন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েকজন ছেলেকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। ক্লাসের প্রতিনিধি হিসেবে আমি তৎক্ষণাৎ অধ্যক্ষ মিঃ এইচ. আর. জেমসের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানালাম, বললাম—যে-ছেলেদের মিঃ ওটেন অপমান করেছেন তাঁদের কাছে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যক্ষ বললেন, তাঁর পক্ষে মিঃ ওটেনকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা সম্ভব নয়, কারণ মিঃ ওটেন ইণ্ডিয়ান এডুকেশনল সার্ভিস-এর লোক। তাছাড়া, তিনি বললেন, মিঃ ওটেন তো কাউকেই মারধোর করেননি, শুধু হাত ধরে সরিয়ে দিয়েছেন—এতে অপমানিত বোধ করার কিছু নেই। জবাবদিহি শুনে আমরা মোটেই খুশি হতে পারলাম না। পরের দিন ছাত্ররা ধর্মঘট করল। অধ্যক্ষ বহু চেষ্টা করেও ধর্মঘট ভাঙতে পারলেন না, এমন কি মৌলবী সাহেবের প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুসলমান ছেলেরা ধর্মঘট থেকে বিরত হল না। স্যর পি. সি. রায় এবং ডক্টর ডি. এন্. মল্লিক—এদের অনুরোধেও কেউ কর্ণপাত করল না। যেসব ছেলেরা ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল অধ্যক্ষ তাদের প্রত্যেককে জরিমানা করলেন।

প্রেসিডেন্সির মতো কলেজে এ রকম জোরালো একটি ধর্মঘটের খবর শহরের চতুর্দিকে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করল। ধর্মঘটের ঢেউ যখন আস্তে আস্তে আরো কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। একজন অধ্যাপক আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তিনি

ভয় পেলেন ধর্মঘটের পাণ্ডা হিসেবে আমাকে হয়তো অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। আড়ালে ডেকে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ধর্মঘটের ফল কী হতে পারে আমি ভেবে দেখেছি কি না। জবাবে আমি যখন বললাম, ভেবে দেখেছি, তিনি আর কথা বাড়ালেন না। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন পূর্ণ হলে কর্তৃপক্ষ মিঃ ওটেনের উপর চাপ দিলেন। মিঃ ওটেন তখন ছাত্র প্রতিনিধিদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ব্যাপারটা ভালোভাবেই মিটমাট করে ফেললেন। দুপক্ষেরই সম্মান বজায় রইল। পরের দিন ক্লাস বসল। যা হবার হয়ে গেছে—এই মনোভাব নিয়ে ছেলেরা যে যার ক্লাস করতে লাগল। সকলেই আশা করেছিল ব্যাপারটা যখন মিটমাটই হয়ে গেছে তখন ধর্মঘটের সময়ে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল এবার সেগুলি রদ করা হবে। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হল না। অধ্যক্ষমহাশয় জরিমানা মাপ করতে কোনোমতেই রাজী হলেন না। তবে, গরিব বলে কেউ ওজর দেখালে, তিনি তাকে মাপ করতে রাজী ছিলেন। ছাত্র, অধ্যাপক কারুর অনুরোধেই তিনি কর্ণপাত করলেন না। ছেলেদের মেজাজ গেল বিগড়ে, কিন্তু তখন আর কিছু করবার ছিল না।

মাসখানেক পরে আবার ওইরকম একটি ব্যাপার ঘটল। খবর পাওয়া গেল—মিঃ ওটেন আবার একটি ছেলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, এবারকার ছেলেটি প্রথম বার্ষিকের ছাত্র। ছাত্ররা চট্ করে বুঝে উঠতে পারল না, এ অবস্থায় কী করা দরকার। আইনসম্মতভাবে ধর্মঘট ইত্যাদি করলে কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, আর অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করলে কোনো ফলই হবে না। অগত্যা কয়েকজন ছেলে স্থির করল তারা নিজেরাই এর ব্যবস্থা করবে। ফলে

মিঃ ওটেন ছাত্রদের হাতে বেদম মার খেলেন। খবর পেয়ে খবরের কাগজের অফিস থেকে শুরু করে লাটভবন পর্যন্ত সর্বত্র ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল।

ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা নাকি মিঃ ওটেনকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছে। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। পেছন থেকে একবারই মাত্র তাঁকে আঘাত করা হয়েছিল, কিন্তু সেও এমন কিছু মারাত্মকভাবে নয়। তাঁকে যারা ঘায়েল করেছিল তারা সকলেই ছিল তাঁর সামনে। ব্যাপারটা আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম, কাজেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল জোর গলায় তার প্রতিবাদ করছি।

এই ঘটনার পরেই বাঙলা সরকার এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে আমাদের কলেজ বন্ধ রাখবার হুকুম দিলেন এবং কলেজে ক্রমাগত কেন গোলমাল হচ্ছে সে সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য একটি তদন্ত-কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দিলেন। সরকারপক্ষ স্বভাবতই সাংঘাতিক খেপে গিয়েছিল, এবং এমনও শোনা গেল প্রয়োজন বোধ করলে চিরকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দিতেও তারা পেছপা হবে না। বলা বাহুল্য, সরকারের তরফ থেকে কলেজ-কর্তৃপক্ষ সবরকম সাহায্যই পেতে পারতেন, কিন্তু একটা গোলমাল হয়ে গেল। সরকারী বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আমাদের অধ্যক্ষের সঙ্গে সরকারপক্ষের বিরোধ দেখা দিল। অধ্যক্ষ মনে করলেন কলেজ বন্ধ রাখবার আদেশ জারি করবার আগে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে সরকার তাঁর আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছেন। এ নিয়ে তিনি শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এক হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। পরের দিনই আর একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ পেল—মান্যবর মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহারের অভিযোগে

ভয় পেলেন ধর্মঘটের পাণ্ডা হিসেবে আমাকে হয়তো অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। আড়ালে ডেকে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ধর্মঘটের ফল কী হতে পারে আমি ভেবে দেখেছি কি না। জবাবে আমি যখন বললাম, ভেবে দেখেছি, তিনি আর কথা বাড়ালেন না। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন পূর্ণ হলে কর্তৃপক্ষ মিঃ ওটেনের উপর চাপ দিলেন। মিঃ ওটেন তখন ছাত্র প্রতিনিধিদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ব্যাপারটা ভালোভাবেই মিটমাট করে ফেললেন। দুপক্ষেরই সম্মান বজায় রইল। পরের দিন ক্লাস বসল। যা হবার হয়ে গেছে—এই মনোভাব নিয়ে ছেলেরা যে যার ক্লাস করতে লাগল। সকলেই আশা করেছিল ব্যাপারটা যখন মিটমাটই হয়ে গেছে তখন ধর্মঘটের সময়ে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল এবার সেগুলি রদ করা হবে। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হল না। অধ্যক্ষমহাশয় জরিমানা মাপ করতে কোনোমতেই রাজী হলেন না। তবে, গরিব বলে কেউ ওজর দেখালে, তিনি তাকে মাপ করতে রাজী ছিলেন। ছাত্র, অধ্যাপক কারুর অনুরোধেই তিনি কর্ণপাত করলেন না। ছেলেদের মেজাজ গেল বিগড়ে, কিন্তু তখন আর কিছু করবার ছিল না।

মাসখানেক পরে আবার ওইরকম একটি ব্যাপার ঘটল। খবর পাওয়া গেল—মিঃ ওটেন আবার একটি ছেলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, এবারকার ছেলেটি প্রথম বার্ষিকের ছাত্র। ছাত্ররা চট্ করে বুঝে উঠতে পারল না, এ অবস্থায় কী করা দরকার। আইনসম্মতভাবে ধর্মঘট ইত্যাদি করলে কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, আর অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করলে কোনো ফলই হবে না। অগত্যা কয়েকজন ছেলে স্থির করল তারা নিজেরাই এর ব্যবস্থা করবে। ফলে

মিঃ ওটেন ছাত্রদের হাতে বেদম মার খেলেন। খবর পেয়ে খবরের কাগজের অফিস থেকে শুরু করে লাটভবন পর্যন্ত সর্বত্র ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল।

ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা নাকি মিঃ ওটেনকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছে। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। পেছন থেকে একবারই মাত্র তাঁকে আঘাত করা হয়েছিল, কিন্তু সেও এমন কিছু মারাত্মকভাবে নয়। তাঁকে যারা ঘায়েল করেছিল তারা সকলেই ছিল তাঁর সামনে। ব্যাপারটা আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম, কাজেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল জোর গলায় তার প্রতিবাদ করছি।

এই ঘটনার পরেই বাঙলা সরকার এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে আমাদের কলেজ বন্ধ রাখবার হুকুম দিলেন এবং কলেজে ক্রমাগত কেন গোলমাল হচ্ছে সে সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য একটি তদন্ত-কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দিলেন। সরকারপক্ষ স্বভাবতই সাংঘাতিক খেপে গিয়েছিল, এবং এমনও শোনা গেল প্রয়োজন বোধ করলে চিরকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দিতেও তারা পেছপা হবে না। বলা বাহুল্য, সরকারের তরফ থেকে কলেজ-কর্তৃপক্ষ সবরকম সাহায্যই পেতে পারতেন, কিন্তু একটা গোলমাল হয়ে গেল। সরকারী বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আমাদের অধ্যক্ষের সঙ্গে সরকারপক্ষের বিরোধ দেখা দিল। অধ্যক্ষ মনে করলেন কলেজ বন্ধ রাখবার আদেশ জারি করবার আগে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে সরকার তাঁর আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছেন। এ নিয়ে তিনি শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এক হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। পরের দিনই আর একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ পেল— মান্যবর মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহারের অভিযোগে

আমাদের অধ্যক্ষকে অনির্দিষ্টকালের জন্য 'সাস্‌পেণ্ড' করা হয়েছে। এদিকে অধ্যক্ষমহাশয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার আগেই তাঁর যথাকর্তব্য সেরে ফেললেন। যেসব ছেলে তাঁর কুনজরে ছিল সবাইকে তিনি ডেকে পাঠালেন। এদের মধ্যে আমিও ছিলাম। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আমাকে তিনি বললেন—"বোস, তোমার মতো বেয়াড়া ছেলে কলেজে আর নেই, তোমাকে আমি সাস্‌পেণ্ড করলাম।" কথাগুলো আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। জবাবে আমি শুধু বলেছিলাম, "ধন্যবাদ!" তারপর বাড়ি চলে এলাম। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের ঘোর মন থেকে কেটে গেল।

এর কয়েকদিন পরেই কলেজের পরিচালক-সমিতির একটি অধিবেশনে অধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্দেশকে সমর্থন জানানো হল। ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আমি বিতাড়িত হলাম। অগত্যা, অন্য কোনো কলেজে ভরতি হবার অধিকার দাবি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলাম। কিন্তু আমার আবেদন অগ্রাহ্য হল। দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমি বিতাড়িত হয়েছি।

এ অবস্থায় কর্তব্য ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। কয়েকজন রাজনীতিক বললেন, তদন্ত-কমিটির হাতে যখন সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তখন অধ্যক্ষের নির্দেশ সম্পূর্ণ বেআইনী। তদন্ত-কমিটি কী রায় দেয় তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

কমিটির সভাপতি ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্‌ চ্যান্সেলর স্যর আশুতোষ মুখার্জি। কাজেই, সুবিচার হবে বলেই আশা হল। ছাত্র-প্রতিনিধিদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হল—মিঃ ওটেনকে মারা উচিত হয়েছিল বলে আমি

মনে করি কি না। জবাবে আমি বললাম, অবশ্যই অন্যায় হয়েছে, কিন্তু ছাত্রদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছিল বলেই তারা অন্যায়টা করেছিল। এরপর গত কয়েক বছর ধরে প্রেসিডেন্সি কলেজে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের অত্যাচারের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বলে গেলাম। আমার অভিযোগ অকাট্য হলেও, অনেকেই মনে করলেন, মিঃ ওটেনকে মারা যে অন্যায় হয়েছে একথাটা বিনাশর্তে মেনে না নিয়ে আমি নিজের ক্ষতি করলাম। আমার কিন্তু মনে হল, ফলাফল যাই হোক না কেন আমি উচিত কাজই করেছি।

শেষ পর্যন্ত সুবিচার পাওয়া যেতে পারে, এই আশায় তখনকার মতো কলকাতায় থেকে গেলাম। যথাসময়ে কমিটি রিপোর্ট পেশ করল। রিপোর্টে ছাত্রদের স্বপক্ষে একটা কথাও ছিল না—এবং তাতে একমাত্র আমার নামই উল্লেখ করা হয়েছিল। আমার শেষ ভরসাটুকুও গেল।

ইতিমধ্যে কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। বহুলোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। এদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন বিতাড়িত ছাত্রও ছিল। আমার দাদারা এইসব দেখে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা মত দিলেন কোনো উপলক্ষ ছাড়া কলকাতায় থাকা মানেই বিপদ ডেকে আনা, কাজেই আমার কটকে চলে যাওয়াই ভালো—সেখানে গোলমালের আশঙ্কা অনেক কম, জায়গাটাও নিরাপদ।

রাত্রে ট্রেনে বাঙ্কের উপর শুয়ে গত কয়েক মাসের ঘটনাবলীর কথা ভাবছিলাম। লেখাপড়া তো এখানেই শেষ, ভবিষ্যৎও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু এজন্য আমি যে দুঃখিত ছিলাম তা নয়, আমি যা করেছি তার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা ছিল না। বরং কর্তব্য পালনের আনন্দে আমার মনটা ভরে ছিল। একটা মহৎ

উদ্দেশ্যে আমার স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছি এবং আত্মসম্মান বজায় রাখতে পেরেছি, এই কথা ভেবে মনে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলাম। আমি যে অন্যায় কিছু করিনি সে সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয়ই ছিল না।

১৯১৬ সালের এই ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটি সে সময়ে আমার কাছে ধরা পড়েনি। আমাদের অধ্যক্ষ কলেজ থেকে আমাকে বিতাড়িত করলেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা আমার পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়াল। আমার ভবিষ্যৎ পন্থা পরোক্ষে তিনিই বাতলে দিলেন। সংকটের সময়ে আমি নির্ভয়ে আমার কর্তব্য পালন করেছি—এই কথা ভেবে নিজের প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মাল। এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই ভবিষ্যতে বহু সংকট, বহু সমস্যা আমি পার হয়েছি। তাছাড়া এই ঘটনা উপলক্ষেই প্রথম আমি নেতৃত্বের স্বাদ পেলাম। এবং নেতাদের যে কী পরিমাণে আত্মত্যাগ করতে হয় সে সম্বন্ধেও খানিকটা ধারণা হল। এক কথায়, জীবনযুদ্ধের জন্য আমি বেশ তৈরি হয়ে উঠলাম।

শিক্ষাপর্বের পুনরারম্ভ

কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যখন কটকে এসে পৌঁছলাম তখন ১৯১৬ সালের মার্চ মাস শেষ হতে চলেছে। সৌভাগ্যের বিষয় বহিষ্কারের কালিমাটা ছাত্রমহলে দেখা দিয়েছিল জয়টিকারূপেই। পরিবারের মধ্যেও সম্পর্কের কোনো হেরফের হল না। আশ্চর্যের বিষয় বাবা কখনো ডেকে জিগগেস করেননি যে কলেজে কী হয়েছিল, বা আমি তার মধ্যে কী করেছিলাম। কলকাতায় আমার বড় দাদারাও ধরে নিয়েছিলেন যে ঐ অবস্থায় আমার যা করণীয় তা আমি ঠিকই করেছি এবং আমার প্রতি তাঁদের সহানুভূতিতেও তাই ঘাটতি পড়েনি। বাবা ও মায়ের নীরবতার মধ্য দিয়েও ধরা পড়ত ছাত্রদের মুখপাত্রের অনিবার্য পরিণতির প্রতি গোপন শ্রদ্ধা। যাদের সঙ্গে দিনরাত্রি কাটাতে হয় তাদের সহানুভূতির অধিকারী হয়ে ভাবনা ঘুচল। কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হবার পরও আমার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ রইল।

পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তাই ব্যাহত না হয়ে বরং উন্নত হল। কিন্তু আমার দল সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির উত্তেজনার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় কাজ করেছিলাম, দলের সঙ্গে পরামর্শের অপেক্ষা রাখিনি। পরে জানতে.

পারি যে আমার কার্যকলাপ তাঁদের সম্পূর্ণ মনোমত হয়নি, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই-এ না নামলেই তাঁরা খুশি হতেন। কলকাতা ছেড়ে যাওয়া যখন স্থির করি তখন তাঁদের খবর পর্যন্ত দিইনি, অথচ কিছুকাল আগেই তাঁদের সঙ্গে দিনরাত্রি কাটিয়েছি, তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনায় যোগ দিয়েছি। ইতিমধ্যে সেই ছোটো গোষ্ঠী শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। প্রধান সভ্যেরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হলেও থাকতেন একই আস্তানায়। প্রত্যহ বিকেলে বাড়ি বা অন্যান্য ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রেরা এসে জুটতেন আলাপ-আলোচনার জন্য। ঘরোয়া প্রচারের উদ্দেশ্যে হাতে-লেখা মুখপত্রও প্রকাশ করা হত। বিভিন্ন বিষয়ে সভ্যদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার বিশেষ ঝোঁক ছিল ধার্মিক ও নৈতিক দিকে, সুতরাং গীতাপাঠ স্বভাবতই এই বৈকালিক আসরের নিয়মিত বরাদ্দ হয়ে দাঁড়াল।

ঘরবাড়ি ও আরামের শয্যা ছেড়ে যেদিন গুরু খুঁজতে বেরিয়েছিলাম সেদিনকার আমি যে হালের ঘটনার পর মনের দিক থেকে অনেক বদলে গেলাম সেটা সহজেই বোঝা যাবে। আচমকা ঝড়ের মতন পরিবর্তন এসে সমস্ত ওলট-পালট করে দিল। কিন্তু ঝড়ের আগেও তলে তলে পরিবর্তন চলেছিল আমার অজ্ঞাতসারে। প্রথমত আমার মন ঝুঁকেছিল সমাজসেবার দিকে। দ্বিতীয়ত সমস্ত খামখেয়ালীপনা সত্ত্বেও নৈতিক দৃঢ়তা আমার মধ্যে ক্রমশই স্থান লাভ করছিল। সুতরাং যেদিন আকস্মিক সংকটে আমার সামাজিক কর্তব্যবোধে টান পড়ল সেদিন আমাকে হার মানতে হয়নি। অবিচলিতভাবে কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি, মাথা পেতে নিয়েছি প্রতিফলের বোঝা। সমস্ত কুণ্ঠা ও সংশয় মুহূর্তে কোথায় ভেসে গেল জানি না। অতঃপর

কিং কর্তব্যম্? লেখাপড়ার রাস্তা একরকম বন্ধ, কারণ কোথায় কখন কী ভাবে আরম্ভ করব জানি না। বহিষ্কার করা হয়েছিল অনির্দিষ্ট-কালের জন্য, অতএব সেটা সারাজীবনের শাস্তিই হয়ে দাঁড়াল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে দয়াপরবশ হয়ে আবার লেখাপড়া শুরু করার সুযোগ করে দেবেন তারও কোনো স্থিরতা নেই। বিদেশ-যাত্রার সম্পর্কে বাবা-মাকে ইশারা জানিয়ে দেখলাম বাবা তার ঘোর বিরোধী। কপালের কলঙ্ক না ঘুচিয়ে বিদেশযাত্রা চলবে না। অর্থাৎ আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, তারপর যা কিছু।

সুতরাং আমার কাজ হল ধৈর্য ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্বিচারের প্রতীক্ষায় থাকা। সময়টাও কাটানো চাই। খাতাপত্র সরিয়ে পুরোদমে সমাজসেবায় লাগলাম। সেকালে উড়িষ্যায় কলেরা ও বসন্তের মহামারীর উৎপাত ছিল প্রবল। ডাক্তার ডাকার সঙ্গতি অধিকাংশেরই নেই, যাদের আছে তাদের পক্ষে ডাক্তারের উপর নার্স জোটানো অসম্ভব। হস্টেলে বা মেসে কলেরা দেখা দিলে রোগীকে ফেলে সবাই চম্পট দিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ লিওনার্ড রজার্সকৃত গবেষণার ফলে স্যালাইন ইঞ্জেকশন আবিষ্কৃত হবার আগে কলেরা ছিল অতি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। সৌভাগ্যক্রমে একদল ছাত্র বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুশ্রূষা করত, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল আমার পুরনো বন্ধু। আমি সানন্দে তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। কলেরা বা বসন্ত জাতীয় মারাত্মক রোগের দিকেই আমাদের বিশেষ ঝোঁক ছিল, তবু অন্যান্য রোগেও যে আমাদের সাহায্য না মিলতো এমন নয়। স্থানীয় সরকারী হাসপাতালের কলেরা ওয়ার্ডেও ডিউটি দিতাম আমরাই, কারণ শিক্ষিত নার্সের সেখানে বন্দোবস্ত ছিল না। শুশ্রূষার ভার ন্যস্ত

হয়েছিল অশিক্ষিত অপরিচ্ছন্ন ঝাড়ুদারদের হাতে। অবশ্য উপযুক্ত শুশ্রূষার এই অভাব সত্ত্বেও দুবছর আগে যেদিন এক বাক্স হোমিও-প্যাথিক ওষুধ আর আধখানা ডাক্তার নিয়ে এই গ্রামে এসেছিলাম, সেদিনকার চেয়ে আজ কলেরা থেকে মৃত্যুর হার অনেক কম। স্যালাইন ইঞ্জেকশনের কাজ অলৌকিক, রোগের গোড়ার দিকে দিতে পারলে শতকরা আশী ভাগ সেরে ওঠার সম্ভাবনা।

কলেরা রোগীদের শুশ্রূষায় অপূর্ব আনন্দ পেতাম, বিশেষত যখন আমাদের শুশ্রূষায় অনেকে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসতো তখন আনন্দের অবধি থাকত না। কিন্তু কোনোরকম সাবধানতার বালাই আমার ছিল না। বাড়ি এসে কখনো জামাকাপড় শুদ্ধির চেষ্টা করিনি, এতক্ষণ কোথায় ছিলাম সে খবরটা যে এগিয়ে গিয়ে সকলকে জানাইনি তা বলাই বাহুল্য। অথচ নিজের ছোঁয়াচ লাগেনি, অপর কাউকেও ছোঁয়াচ দিইনি। কী করে এমন হল ভেবে পাই না।

কলেরা রোগী ঘাঁটতে, মায় নোংরা জামাকাপড় নাড়াচাড়া করতেও ঘৃণাবোধ হয়নি। মুশকিল বাধত আসল বসন্ত নিয়ে। গুটিগুলো যখন ভালোরকম পেকে উঠতো তখন রোগীর কাছে বসে থাকার জন্যই মনের সমস্ত জোরটুকু খাটাতে হত। তবু এই স্বেচ্ছাকৃত কাজের একটা শিক্ষার দিক ছিল, তাই ফেলতে পারিনি।

শুশ্রূষার সঙ্গে এসে জুটল আরো নানান উপসর্গ। চিকিৎসা সেবা-শুশ্রূষার পরও যারা মারা যায় তাদের কী গতি হবে? মৃতদেহের ভার নেবার, সৎকার করবার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। যেসব মড়ার দাবিদার কেউ ছিল না সেগুলোকে মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারেরা যেমন তেমন করে পার করে দিত। কিন্তু মৃত্যুর পর এমন ব্যবহার কোন লোকে কামনা করে? সুতরাং সৎকারের ভারটাও নিতে

হত আমাদেরই। দেশী নিয়ম অনুসারে মড়া ঘাড়ে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়াতে হত। যেক্ষেত্রে মৃতের টাকাপয়সা-ওয়ালা আত্মীয়-স্বজন থাকতো, অভাব হত শুধু শ্মশানবন্ধুর, সেক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হত সহজেই। কিন্তু সৎকারের পয়সা অনেক ক্ষেত্রে জুটতো না, ঝুলি নিয়ে বেরুতে হত চাঁদার ধান্ধায়। আমরা যাদের শুশ্রূষা করেছি তাদের ছাড়া অন্যদের বেলায়ও সৎকারের জন্য ডাক পড়ত, এবং তাতে সাড়া দিতাম।

সেবা-শুশ্রূষার কাজ ভালো লাগলে কী হবে, সমস্ত সময় তাতেও কাটতো না। তাছাড়া এ একটা সাময়িক প্রয়োজন। জাতীয় দুর্দৈবের স্থায়ী সমাধান এর মধ্যস্থতায় হবার নয়। দলের আলাপ-আলোচনায় দেশগঠনের কাজকে অবহেলা করে শুধু হাসপাতাল, দুর্ভিক্ষ আর বন্যা নিয়ে মেতে থাকার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচুর মুণ্ডপাত করেছি; তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করি এমন ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং যুবসংগঠনে হাত দিলাম। বহু যুবককে একত্র করলাম, তাদের নানান শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিভাগসহ এক সংগঠন খাড়া করা হল। যতদিন আমি ছিলাম ততদিন এই কাজ ভালোই চলেছিল। এই সময়ে অস্পৃশ্যতার সমস্যায় পড়তে হল। আমাদের প্রিয় আস্তানা এক হস্টেলে মাঝি নামে একটি সাঁওতাল ছাত্র থাকত। সাধারণত সাঁওতালরা নিচু জাত বলে ছিল অবজ্ঞার পাত্র; কিন্তু ছাত্রদের দিলদরিয়া মেজাজে জাতের শুচিবাই লাগেনি, মাঝিকে হস্টেলে সানন্দে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন বেশ চলল। তারপর একদিন একটি ছাত্রের চাকর মাঝি সাঁওতাল জানতে পেরে অন্য চাকরদের খেপিয়ে তুলে গোলমাল বাধাতে চেষ্টা করল। মাঝিকে না তাড়ালে কোনো চাকর কাজ করবে না এই তার দাবি। সুখের বিষয়,

এই দাবিতে কান দেবার মেজাজ কারুরই ছিল না, গোলমালটা মিটে গেল ভালো করে শুরু হবার আগেই। আমার যেটা চোখে লাগল সেটা হচ্ছে এই যে উঁচুজাতের ছাত্ররা মাঝিকে নিয়ে আপত্তি তোলেনি, আপত্তি তুলল কি না চাকরটা, যে নিজেই যথেষ্ট নিচু জাতের লোক! এ ব্যাপারের অল্পদিন পরেই মাঝি টাইফয়েডে পড়ল। আমরা বিশেষভাবে ওর সেবাযত্ন শুরু করলাম। আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম যখন মা এসে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন।

সময় কাটাবার জন্য বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিভিন্ন তীর্থস্থান ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক জায়গাগুলি পরিদর্শন করতে শুরু করলাম। খোলা হাওয়া ও যথেষ্ট হাঁটাচলা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, তাছাড়া তাতে অপরের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভের যে সুযোগ মেলে সেটা ঘরের ভিতরে পাবার নয়। ঘরবন্দী জীবনের অখণ্ড আলস্য থেকেও পালিয়ে বাঁচলাম, বইপড়া বা যোগাভ্যাসের প্রতি কোনো আকর্ষণ আর ছিল না। দেশী পুজো-পার্বণের মধ্য দিয়ে দলকে গড়ে তোলার এক পরীক্ষায় নামলাম। আমাদের পুজো-পার্বণ চিরকালই গোটা সমাজের উৎসব। যেমন ধরা যাক দুর্গাপুজো। নিছক পুজোটা যদিও পাঁচ দিনের ব্যাপার তবু তার ব্যবস্থা বন্দোবস্তে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে, সব জাতের, সব ব্যবসার লোকই কাজে লাগে কোনো না কোনো দিকে। এক বাড়িতে পুজো হলেও গোটা গ্রামটা তাতে যোগ দেয়, এমন কি দুপয়সা উপায়ও করে নিতে ছাড়ে না। আমার ছেলেবেলায় গ্রামে পুজোর শেষদিনে যে যাত্রা হত তাতে জমায়েৎ হত গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই। গত পঞ্চাশ বছরে গ্রাম্য লোকের দারিদ্র্য বেড়ে গেছে, প্রবাসী হয়েছে বহুলোক, পুজো-পার্বণের আর সে ধুমধাম নেই। কোথাও কোথাও সে পাট একেবারেই চুকে গেছে।

ফলে গ্রামের মধ্যে টাকাপয়সার লেনদেন কম্‌তির দিকে, সমাজজীবন প্রাণহীন, নীরস।

আরেক রকমের পালাপার্বণে সমাজের লোক যোগ দেয় আরো বেশি। সে হচ্ছে বারোয়ারী পুজো। কিন্তু তারও দিন ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। ১৯১৭ সালে আমরা নানান দিক ভেবে এক বারোয়ারী পুজোর আয়োজন করলাম। ধুমধাম হল প্রচুর, লোকের উৎসাহ দেখে অন্যান্য বছরও এ ব্যবস্থা বহাল রইল।

মনের দিক থেকে এ সময় আমার অগ্রগতি হয় যে বিষয়ে সেটা হচ্ছে আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাস। বহুকাল ধরে এ অভ্যাস আমার জীবনের অঙ্গ হয়ে রয়েছে, এবং সুফল দিয়েছে প্রচুর। আর কিছু নয়, নিজের মনের উপর সন্ধানী আলো ফেলে তাকে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করা। রোজ রাত্রে ঘুমের আগে বা ভোরে ঘুমভাঙার পর খানিকটা সময় আত্মচিন্তায় কাটাতাম। দুরকমের বিশ্লেষণ এর অঙ্গ ছিল—এক বর্তমানের যে আমি, তার বিশ্লেষণ, আরেক আমার সমগ্র জীবনের বিশ্লেষণ। প্রথমটা থেকে জানা যেত আমার মনের কামনা-বাসনা, আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়টা থেকে আমার জীবনকে ভালো করে চিনতাম, তার বিকাশকে প্রত্যক্ষ করতাম। অতীতের ব্যাকুলতার চিন্তা দিয়ে উপলব্ধি করতাম অতীতের ভ্রান্তি, ভবিষ্যতের পথ।

আত্মবিশ্লেষণে বেশি দিন যাবার আগেই নিজের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি তথ্য আবিষ্কার করলাম। এক, নিজের মন সম্বন্ধে এতদিন কত অজ্ঞ ছিলাম, জানিনি আমার মনের গোপন অন্ধকারে কত জঘন্য প্রবৃত্তি সাধুবেশ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুই, যে মুহূর্তে নিজের অন্তর্নিহিত হীনতাকে জেনেছি সেদিনই তাকে অর্ধেক জয় করা হয়ে গেছে। মনের দুর্বলতা দেহের রোগের মত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত

আড়ালে থাকে ততক্ষণই তার চোটপাট। আলোতে যখনি তাকে টেনে আনে তখনি সে ধেয়ে পালায়।

আত্মবিশ্লেষণের প্রথম প্রয়োগ হল কতকগুলি স্বপ্নের উপদ্রবের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য। এ জাতের স্বপ্নের বিরুদ্ধে আমার আগেকার লড়াইও বিফল হয়নি, তবে আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সাফল্য এল আরো সহজে, আরো সম্পূর্ণ করে। প্রথম দিকে যেসব অপ্রিয় স্বপ্ন দেখতাম তার মধ্যে প্রধান ছিল সাপ ও বন্য জন্তুর স্বপ্ন। সাপের স্বপ্নের হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাত্রে ঘুমোবার আগে কল্পনা করতাম যে আমার চারিদিকে অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে এবং মনে মনে আবৃত্তি করতাম: 'আমি সাপের ভয় করি না, মৃত্যুর ভয় করি না'। এই চিন্তার মধ্যে সাধারণত ঘুমিয়ে পড়তাম। কয়েকদিন অভ্যাসের পরই পরিবর্তন টের পাওয়া গেল। সাপের দেখা মিলতো কিন্তু ভয় হত না। ক্রমে ক্রমে সাপও বিদায় নিল। অন্যান্য জন্তুর স্বপ্নও এই চিকিৎসায় ধীরে ধীরে কেটে গেল। তারপর থেকে আর এ বিপদে পড়তে হয়নি।

কলেজ থেকে বহিষ্কারের সময়ে স্বপ্ন দেখতাম তল্লাসীর আর গ্রেপ্তারের—অবশ্যই আমার অবচেতন ভাবনা চিন্তা ও গোপন আশঙ্কার প্রকাশ। কিন্তু কয়েকদিন মানসিক ব্যায়ামের পর এ রোগও সেরে গেল। তল্লাসী আর গ্রেপ্তার চলছে, আমি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছি না, হব না, এই চিন্তাই রোগ সারাবার পক্ষে যথেষ্ট হত।

আরেক জাতের স্বপ্নের উপদ্রব ছিল সে হচ্ছে যে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেই বা যার ফল খারাপ হয়েছে তার সম্বন্ধে স্বপ্ন। এগুলিকে সামলাবার জন্য অনবরত জপ করতে হত যে, পরীক্ষার জন্য আমি প্রস্তুত, পাশ করবই, ইত্যাদি। আমি এমন বহুলোককে জানি যাঁরা

শেষ বয়স পর্যন্ত স্বপ্নের উপদ্রবে নাজেহাল হন, এমন কি আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়েন। এঁদের হয়ত বহুকাল অভ্যাসের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু লেগে থাকলে শেষ পর্যন্ত ফল মিলবে ঠিকই। কোনো বিশেষ জাতের স্বপ্ন যদি ক্রমাগতই উত্যক্ত করতে থাকে তবে তার প্রকৃতি জানবার জন্য আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা চাই।

সবচেয়ে কঠিন লড়াই হচ্ছে যৌন স্বপ্নের ব্যাপারে। যৌনপ্রবৃত্তি মানুষের গভীরতম সহজাত সংস্কারগুলির মধ্যে অন্যতম। তার উপর যৌনতার ঋতু ঘুরে ফিরে আসে, কিছুদিন পরে পরে স্বপ্নের দরজা খুলে দেয়। তা হলেও অন্তত আংশিক অব্যাহতি পাওয়া শক্ত নয়, এই আমার অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে উপায় হচ্ছে আকর্ষণের বস্তুকে কল্পনা করে সেই সঙ্গে জপ করা, এতে আমি উত্তেজিত হই না, হব না, কামকে আমি জয় করেছি। নারীমূর্তিতে যদি কামনা জন্মায় তবে তাকে মা বা বোনের মূর্তিরূপে কল্পনা করাই বাঞ্ছনীয়। যৌনতার এমন একটা নিয়মিত জোয়ার-ভাঁটা আছে যা অন্য কোনো প্রবৃত্তিরই নেই একথা জানা না থাকলে যৌন-স্বপ্নের বিরুদ্ধে লড়াইএ সহজেই হার মানার ভয় আছে। সাহস না হারাতে হলে একথাও মনে রাখতে হবে যে যৌনপ্রবৃত্তিকে জয় করা বা তার উর্ধ্বগতি করা অনেকখানি ধৈর্যের অপেক্ষা রাখে।

নিজের কাহিনীতে ফিরে যাওয়া যাক। এক বৎসর বনবাসের পর কলকাতায় ফিরলাম। উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আরেকবার বাজিয়ে দেখা। কঠিন কাজ, কিন্তু তার চাবিকাঠি ছিল স্যার আশুতোষের হাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই তখন হর্তাকর্তা বিধাতা। তাঁর অঙ্গুলি হেলনে আমার দণ্ডাদেশ রহিত হতে পারে। ব্যাপারটার

কিনারা হবার অপেক্ষায় বসে বসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, আমার শক্তিকে কাজে লাগাবার একটা পথ না পেলে বাঁচি কী করে? ঠিক সে সময় ৪৯তম বাঙালী রেজিমেণ্টে ভরতি চলছে। য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে এক ফৌজ ভরতির সভায় গিয়ে প্রচুর উৎসাহ সঞ্চয় করা গেল। পরদিন চুপচাপ বিডন স্ট্রীটের আফিসে স্বাস্থ্যপরীক্ষার কামরায় গিয়ে ধর্না দিলাম। ফৌজের স্বাস্থ্যপরীক্ষা অতি জঘন্য ব্যাপার, লজ্জাবোধের ধারকাছ দিয়েও ঘেঁষে না। আমি অবিচলিত-ভাবে পরীক্ষা দিলাম। আর সব পরীক্ষা পেরোবো জানা ছিল, ভয় ছিল শুধু চোখ সম্বন্ধে, কারণ দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট সবল ছিল না। আই. এম. এস. অফিসারটি ছিলেন ভারতীয়, তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করলাম যে আমাকে উপযুক্ত বলে চালিয়ে দিন। কিন্তু তিনি সখেদে জানালেন যে চোখ পরীক্ষা করার জন্য আমাকে অন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বাঙলায় বলে যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। দ্বিতীয় ডাক্তার, মেজর কুক, চোখের সম্বন্ধেই আবার বিশেষ খুঁৎখুঁতে। অন্য সব পরীক্ষায় পাশ করেও, চোখের বেলায় আমি তলিয়ে গেলাম। ফৌজে যোগ দেওয়া হল না, ভগ্নহৃদয়ে বাড়ি ফিরলাম।

শোনা গেল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা এবার প্রসন্ন হয়েছেন, কিন্তু একটা কলেজ খুঁজে বার করতে হবে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে ভরতি হতে পারি। বঙ্গবাসী কলেজ আমাকে ভরতি করতে রাজী হল, কিন্তু দর্শনে অনার্সের বন্দোবস্ত সেখানে ছিল না। অতএব স্থির করলাম স্কটিশ চার্চে গিয়ে হাজির হব। একদিন সকালবেলা কোনো পরিচয়পত্রের অপেক্ষা না রেখে সিধে প্রিন্সিপাল ডক্টর আরকিউহার্টের ঘরে ঢুকে বললাম আমি বহিষ্কৃত ছাত্র, কিন্তু

বিশ্ববিদ্যালয় আমার দণ্ড রহিত করবেন, আমি তাঁর কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়তে চাই।

বোঝা গেল আমার সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি খুশি হয়েছেন, কারণ স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রবেশের অনুমতি সহজেই মিলল। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্ যদি বাধা না দেন, এবং তাঁর আপত্তি নেই এই মর্মে যদি একটি চিরকুট এখানে উপস্থিত করা যায় তবে পথ উন্মুক্ত। কিন্তু এই আপাতসামান্য বাধা দূর করা আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ ছিল না। মেজদা শরৎচন্দ্র বসু তখন কলকাতায় আমার তত্ত্বাবধায়ক, তিনিই অবশেষে এ কাজের ভার নিলেন। আলাপ-আলোচনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সাহেবের মনোভাব নাকি মোটামুটি প্রসন্নই, তবে কিনা আমার সঙ্গে তাঁর একবার সাক্ষ্যাতের প্রয়োজন। অতএব ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সাহেবের দরজায় হাজির হলাম। গত বৎসরের ঘটনা সম্বন্ধে দীর্ঘ জেরার ধাক্কা সামলাতে হল। অবশেষে তিনি মত দিলেন যে অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎটাই অধিক জরুরি, অতএব তিনি আমার পথ আগলে দাঁড়াবেন না। এর বেশি আমার আর কিছু প্রয়োজন ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল না বিন্দুমাত্র।

কলেজে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া নিয়ে আবার মেতে উঠলাম। ইতিমধ্যে দুটি বৎসর খুইয়েছি, জুলাই ১৯১৭ সালে যখন আবার থার্ড ইয়ারে ভরতি হলাম তখন আমার পূর্বতন সহপাঠীরা বি. এ.র কোঠা পেরিয়ে এম. এ.তে পা দিয়েছে। কলেজে দিন কাটতে লাগল অখণ্ড শান্তিতে। ডক্টর আরকিউহার্টের মতো বিবেচক প্রিন্সিপ্যাল বর্তমান থাকতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঠোকাঠুকির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ছিলেন দর্শনের পণ্ডিত, কিন্তু দর্শন ছাড়া বাইবেলের উপরও বক্তৃতা করতেন। তাঁর বাইবেলের পাঠ ছিল

আশ্চর্য হৃদয়গ্রাহী। বাইবেল ক্লাসের প্রতি আমার অরুচির ভাবটা কেটে গেল। পি. ই. স্কুলের বাইবেল পাঠ থেকে আর্কিউহার্টের পাঠের তফাতটা আসমান জমিনের তফাত। কলেজ-জীবন মোটের উপর নীরসভাবেই কাটতে লাগল। দর্শনসমিতি ও অন্যান্য সমিতির সভায় অবশ্য আনাগোনা করতাম। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে উত্তেজনার খোরাক জুটল অন্যদিক থেকে।

সরকার তখন সবেমাত্র ভারতরক্ষা বাহিনীতে একটি ইউনিভার্সিটি ইউনিট গড়ে তুলতে রাজী হয়েছেন। এক ডবল কম্প্যানি গঠনের উদ্দেশ্যে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। সাধারণ সৈন্যদলের মতো এখানে শারীরিক পরীক্ষা, বিশেষত চক্ষুপরীক্ষায় কড়াকড়ি কম হবে ভেবে আশা হল নিজের সম্বন্ধে। ভারতীয় পক্ষ থেকে এই পরীক্ষার বিরাট উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডক্টর সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী। বাঙালীদের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের সীমা পরিসীমা ছিল না। এবার আর আমার আশাভঙ্গের কারণ ঘটল না। গড়ের মাঠে মুর্ফাতি পরে আমাদের শিক্ষানবিশী শুরু হল। ফোর্ট উইলিয়ম থেকে আমদানি হল লিঙ্কন্স রেজিমেণ্ট-মার্কা অফিসার ও ইন্স্ট্রাক্টর। প্রথম দিনের হাজিরায় যে দলটি উপস্থিত হল তার চেহারার বৈচিত্র্য দেখে তাক লাগে। কেউ বাঙালী কায়দায় ধুতি পরা, কারুর বা আধামিলিটারি ঢঙে হাফ্‌প্যাণ্টশোভিত অঙ্গ, কারুর পরনে ট্রাউজার, কেউ খালি মাথায়, কেউ পাগড়ি-ওয়ালা, কেউ হ্যাট-পরা ইত্যাদি। দেখে মনে হত না যে এই বিচিত্র জঙ্গলের ভিতর থেকে শিক্ষিত সৈন্যদল বেরুতে পারে। কিন্তু দুমাস বাদে আমরা যখন ফোর্ট উইলিয়মের কাছে তাঁবু গাড়লাম, মিলিটারি উর্দি পরে কুচকাওয়াজ শুরু করলাম, তখন সকলের ভোল বদলে

গেছে। চার মাস ক্যাম্প-জীবন কাটল বিপুল আনন্দে। কিছুদিন শুধু বেলঘরিয়ায় চাঁদমারি চর্চায়ই অতিবাহিত হল। সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় বসে ভগবৎলীলা শ্রবণ থেকে ইংরেজ আর্মি অফিসারের হুকুমে রাইফেল কাঁধে ঘাড় ফেরানো—কী বিপুল পরিবর্তন! প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমরা যাইনি, সত্যিকারের রোমহর্ষক কিছু আমাদের জীবনে ঘটল না। তবু ক্যাম্প-জীবন সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহ ছিল অসীম। এর আগে কখনো সৈনিক-জীবনের স্বাদ পাইনি, তবু যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের একজোট হয়ে থাকার যে বন্ধন, যাকে বলা হয় 'এস্প্রি দ্য কোর', তাকে অনেকখানি উপভোগ করেছিলাম ক্যাম্প-জীবনে। কুচকাওয়াজ ছাড়া নানারকম অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল, সরকারী বেসরকারী দুরকমেরই। খেলা-ধুলারও চর্চা হত যথেষ্ট। শিক্ষানবিশীর শেষভাগে অন্ধকারে নকল যুদ্ধ হত, তার উত্তেজনা ছিল প্রবল। দলে হাসির খোরাক যোগাবার লোকও ছিল, তাদের ঠাট্টা করে দিন কাটত মন্দ নয়। গোড়ার দিকে তাদের একটা আলাদা দল করে দেওয়া হয়েছিল যার নাম ছিল 'অকওয়ার্ড স্কোয়াড', অর্থাৎ কি না 'গঙ্গারামের দল'। উন্নতি করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়মিত প্ল্যাটুনে ভরতি করে নেওয়া হত। এদের মধ্যে একজনের আমরা নাম দিয়েছিলাম জ্যাক জনসন। সে আর কোনো-দিনই হাঁদা গঙ্গারামত্বের মায়া কাটাতে পারল না, শেষ পর্যন্ত তার অঙ্গভঙ্গী ছিল বিচিত্র, অফিসার কম্যাণ্ডিং-এর পর্যন্ত তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

আমাদের ও. সি. ক্যাপটেন গ্রে ছিল অদ্ভুত এক চরিত্র। এমনিতে সে র‍্যাঙ্কার, বৃটিশ আর্মির অভিজাত সন্তান। তার চেয়ে ভালো শিক্ষক কোথায় মিলবে আমি জানি না। রুক্ষপ্রকৃতির স্কচ্, মোটা কর্কশ

গলা, প্যারেডের মাঠে তার মুখে একটা ভেংচি লেগেই আছে। কিন্তু তার মনটা একেবারে খাঁটি। উদ্দেশ্য তার কখনো এতটুকু মন্দ থাকত না, দলের লোকেরা সেটা জানত, তাই রুক্ষ ব্যবহার সত্ত্বেও তার প্রতি সকলের প্রীতি ছিল অক্ষুণ্ণ। ক্যাপ্টেন গ্রে'র জন্যে জান কবুল—এই ছিল তখনকার মনোভাব। যখন সে আমাদের হাতে নিয়েছিল তখন ফোর্ট উইলিয়মের অন্যান্য অফিসারেরা বলেছিল যে আমাদের দ্বারা পল্টনগিরি কখনো হবে না। ক্যাপ্টেন গ্রে দেখিয়ে দিল যে তাদের হিসাব কত ভুল। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত লোক হওয়ায় আমরা সহজেই শিখে নিলাম। সাধারণ সৈনিকের যা শিখতে লাগত কয়েকমাস, সেটা কয়েক সপ্তাহেই ধাতস্থ হয়ে যেত। তিন সপ্তাহের চাঁদমারি চর্চার পর আমাদের সঙ্গে ইন্‌স্ট্রাক্টরদের এক প্রতিযোগিতা হল এবং তাতে ইন্‌স্ট্রাক্টররা হেরে ভূত হয়ে গেল। তারা বিশ্বাসই করতে চাইল না যে আমরা আগে কখনো রাইফেল ছুঁইনি। একদিন প্ল্যাটুন-ইন্‌স্ট্রাক্টরকে জিগগেস করেছিলাম যে সৈনিক হিসাবে আমাদের সম্বন্ধে তার সত্যিকারের ধারণাটা কী। উত্তরে সে বলেছিল যে প্যারেডে আমাদের খুঁত ধরা শক্ত, কিন্তু আমাদের লড়াই-এর হাড় কতখানি মজবুত সেটা সত্যিকারের যুদ্ধ ছাড়া বোঝা যাবে না। আমাদের রূপান্তর দেখে ও. সি. খুশি হয়েছিল, অন্তত ক্যাম্প যখন ভাঙল তখন তাই বলেছিল আর যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সভায় আমরা বাঙলার লাটকে গার্ড অফ অনার দিলাম সেদিন লাটসাহেবের মিলিটারি সেক্রেটারি আমাদের প্যারেড দেখে অভিনন্দন জানানোতে তার গর্বের অবধি ছিল না। নববর্ষের প্রোক্ল্যামেশন-প্যারেডে যেদিন আমরা উত্‌রে গেলাম সেদিন তার খুশির মাত্রাটা আরো বেশি।

সৈনিক-জীবনে যেদিন এত আনন্দ পেতাম সেদিন থেকে কতদূর

বদলে গেছি নিজেই জানি না। শুধু যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে অসুবিধা হয়নি তা নয়, সত্যিকারের আনন্দ পেয়েছিলাম। এই ট্রেনিং আমার কী যেন একটা অভাব পূর্ণ করল, আমার আত্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। সৈনিক হিসাবে আমাদের কতকগুলি অধিকার ছিল, যেগুলি ভারতীয় হিসাবে পাওয়া যেত না। ভারতীয় হিসাবে আমাদের কাছে ফোর্ট উইলিয়মের দরজা ছিল বন্ধ, কিন্তু সৈনিক হিসাবে সেখানে ঢুকতে পেতাম, এবং প্রথম যেদিন রাইফেল আনবার জন্য ফোর্টে আমাদের প্রবেশ, সেদিন একটা আশ্চর্য তৃপ্তির অনুভূতি হয়েছিল, যেন আমাদের নিজেদের কোনো বস্তু থেকে আমাদের এতদিন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল, এবার সেই অধিকার পেয়েছি। শহরের মধ্য দিয়ে রুটমার্চগুলোও ভালো লাগত, কারণ তাতে নিজেদের জাহির করার একটা আনন্দ ছিল। পুলিশ ও অন্যান্য যেসব সরকারী লোকেদের লাঞ্ছনা গঞ্জনায় আমরা অভ্যস্ত তাদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার সুখটা পেতাম পুরোমাত্রায়।

সারা থার্ড ইয়ারটা কাটল পল্টনগিরির উত্তেজনার মধ্যে। ফোর্থ ইয়ারে উঠে সত্যিকারের লেখাপড়া আরম্ভ হল। ১৯১৯ সালের বি. এ. পরীক্ষায় ফল ভালো হলেও আশানুরূপ হল না। দর্শনে ফার্স্ট ক্লাস জুটল, কিন্তু স্থান পেলাম দ্বিতীয়। আগেই বলেছি দর্শন সম্বন্ধে আমার মোহ অনেকটা কেটে এসেছিল। এম. এ.তে দর্শন পড়ার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। দর্শনে বিচারবুদ্ধি খোলে, সন্দেহবাদ বাড়ে, চিন্তাকে সংহত করে, কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান কই? নিজের সমস্যার সমাধান হয় নিজের দ্বারাই। এ সমস্ত চিন্তা ছাড়া আরো কারণ ছিল। গত তিন বৎসরে আমার মনেও রূপান্তর হয়ে গিয়েছে। স্থির করলাম এম. এ.তে পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব

(এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি) নিয়ে পড়ব। এই নতুন বিজ্ঞানে আমার ঝোঁক চেপে গেল সহজেই, কিন্তু এই নিয়ে লেগে থাকা কপালে ছিল না।

বাবা তখন কলকাতায়। একদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠাতে গিয়ে দেখি একটা ঘরে মেজদার সঙ্গে বসে আছেন। জিগগেস করলেন আই. সি. এস. দেবার জন্য বিলেতে যেতে চাই কি না। যদি যাবার ইচ্ছা থাকে তো যত শিগগির সম্ভব রওনা হতে হবে। প্রস্তাব চিন্তা করে দেখার জন্য সময় মিলল চব্বিশ ঘণ্টা। আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। কয়েক ঘণ্টা চিন্তার পর যাওয়াই স্থির করলাম। মনস্তত্ত্বের গবেষণা মাথায় উঠল। যা কিছু ভেবে চিন্তে স্থির করতে যাই সবই ঘটনার দুর্বার স্রোতে ভেসে যায়। মনস্তত্ত্বকে বিদায় দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু আই. সি. এস. বনে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কাজ করাটা সহজে মনঃপূত হতে চায় না। নিজেকে প্রবোধ দিলাম যে বিলেতে গিয়ে গুছিয়ে বসতে বসতে পরীক্ষার আর আট মাস থাকবে, যা আমার বয়েস তাতে সুযোগ মিলবে একটি মাত্র, সুতরাং ও পরীক্ষায় পাশ করে ব্রিটিশের অধীনতা করার ভরসা কম। আর যদি বা কোনোক্রমে উত্‌রেও যাই, কী করব না করব স্থির করার অপর্যাপ্ত সময় থাকবে।

এক সপ্তাহের নোটিশে কলকাতা ত্যাগ। সারা পথ জাহাজে যাবার মতো ব্যবস্থা কোনোক্রমে করা গেল। মুশকিল বাধল পাসপোর্ট নিয়ে। বাঙলার মতো প্রদেশে এ ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। এবং পুলিশের দৃষ্টিতে আমার ইতিহাস নিতান্ত নির্দোষ না হবারই কথা। সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ বিভাগে আমাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের সাহায্যে

ছ'দিনের মধ্যেই আমার পাসপোর্ট আদায় হয়ে গেল। বিচিত্র ব্যাপার বটে!

আমার জীবনে আবার অপ্রত্যাশিত মোড় ঘুরে গেল আমারি ইচ্ছায়। দলের কাছে যখন বিলেত যাত্রার কথা তুলেছিলাম তখন তারা সেটাকে মোটে আমলই দেয়নি। ইতিপূর্বে দলের একজন উৎসাহী কর্মী বিলেত গিয়ে সেখানেই বিয়ে করে বসবাস করছেন। এমন নমুনার পর আবার ঝুঁকি নেওয়া কেন? কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা অটল। দলের একজন বিপথে গেছে তাতে কী? অন্যেরাও যে তার পথই অনুসরণ করবে তার কোনো স্থিরতা নেই। কিছুদিন যাবৎ দলের সঙ্গে আমার যোগটা ঢিলে হয়ে আসছিল। ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর-এ যোগ দেবার সময় আমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করিনি। এবার একেবারে যবনিকাপাত। মুখে কেউই কিছু বললাম না বটে, কিন্তু নিজের আলাদা পথ তৈরির স্বপ্নে আমি এতই মশগুল হয়ে উঠেছিলাম যে মিলিত পথের শেষ এখানেই, এটা বুঝতে কারুর সময় লাগেনি।

এরপর ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ সম্পর্কে প্রাদেশিক উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। আমাকে তিনি দেখেই চিনলেন। কলেজ-খেদানো ছাত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা যে তেমন উঁচু ছিল না সেকথা বলাই বাহুল্য। আমি আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে চাই শোনামাত্র তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন আমাকে নিবৃত্ত করার জন্য। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের নিখুঁত ছাত্রদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার আশাই বাতুলতা, সুতরাং দশ হাজার টাকা আর জলে ফেলে দেওয়া কেন? বারবার এই কথাটারই তিনি পুনরাবৃত্তি

করছেন দেখে আমি নিরুপায় হয়ে বললাম, "বানা চান যে আমি দশ হাজার টাকা নষ্ট করি।" তারপর দেখলাম ভদ্রলোক আমার কেম্ব্রিজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নন, সুতরাং বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করলাম।

সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে ইংলণ্ডে ভাগ্যপরীক্ষার পণ করে ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রওনা হলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

কেম্ব্রিজে

যখন ভারতবর্ষ ছাড়ি তার কিছুদিন আগেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পাঞ্জাবের বাইরে তার খবর প্রায় পৌঁছয়নি, কারণ গোটা পাঞ্জাব তখন সামরিক আইনের কবলে, খবরাখবরের ব্যাপারে প্রবল কড়াকড়ি। সুতরাং লাহোর ও অমৃতসরে নানা ভয়াবহ ঘটনার ভাসা ভাসা গুজবমাত্র আমাদের কানে এসেছিল। আমার এক সিমলাবাসী ভায়ের মুখে শুনেছিলাম পাঞ্জাবের ঘটনার, ও ইংরেজ-আফগান যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয়ের কথা। কিন্তু এ সমস্তই ছিল গুজব, মোটের উপর উত্তর-পশ্চিম ভারত সম্বন্ধে সাধারণ ছিল অজ্ঞ। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মন নিয়ে য়ুরোপ যাত্রা করলাম।

জাহাজে অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে পরিচয় হল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র। সুতরাং সকলে মিলে একটু স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবার জন্য একটা আলাদা টেবিলে বসা স্থির করলাম। আমাদের টেবিলে নেতৃত্ব করতেন এক আই. সি. এস. অফিসারের বিধবা, বয়স্কা পত্নী। জাহাজের অধিকাংশ যাত্রীই ছিলেন রোদে-পোড়া উঁচুকপালে ইংরেজ। তাদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল প্রায় অসম্ভব, তাই আমরা ভারতীয়েরা একত্র ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতাম। এটা-সেটা নিয়ে প্রায়ই ইংরেজ-ভারতীয়ে ঠোকাঠুকি লাগত, এবং শেষ পর্যন্ত যদিও ব্যাপার

তেমন গুরুতর দাঁড়ায়নি, তবু এই ইংরিজি ঔদ্ধত্যে আমাদের গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল। একটা মজার জিনিস জাহাজে থাকতে আবিষ্কার করা গেল, সেটা হচ্ছে ভারতের বাইরে আসার পর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ভারতপ্রীতি। যত য়ুরোপের কাছে আসে দেশ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ, তাদের টানে তত বেশি করে। ইংলণ্ডে তাদের ইংরেজ বলে পার হবার জো নেই, তার উপর আত্মীয়-স্বজন নেই, ঘরবাড়ি নেই, বন্ধুবান্ধব নেই। সুতরাং যতই ভারতবর্ষ থেকে দূরে পড়ে ততই বোধ করতে থাকে ভারতবর্ষের টান।

সিটি অফ ক্যালকাটার চেয়ে ঢিমে তালের জাহাজ খুঁজে পাওয়া শক্ত। যেখানে ত্রিশ দিনে তার টিলবারি পৌঁছনোর কথা সেখানে লাগল সাঁইত্রিশ দিন। বিলেতের কয়লাখনিতে ধর্মঘটের ফলে সিটি অফ ক্যালকাটা সুয়েজখালে কয়েদ হয়ে ছিল কয়েকদিন। যাই হোক, পথে অনেক বন্দরে নামা গিয়েছিল এটাই সান্ত্বনা। পাঁচ সপ্তাহের একঘেয়ে জীবনকে একটু সরস করে তোলার জন্য আশ্রয় নিতে হয়েছিল হাজার রকমের হাসিঠাট্টার। একজন সহযাত্রীর উপর তার স্ত্রীর হুকুম ছিল বীফ কখনো ছোঁবে না। একদিন মাটন কোপ্তা কারি বলে তাকে বীফ খাইয়ে দিল আরেকজন প্যাসেঞ্জার। বেচারা প্রবল ফূর্তির সঙ্গে খেয়ে বারো ঘণ্টা পরে যখন আবিষ্কার করল যে সে বীফ খেয়েছে, তখন তার কী দুঃখ! আরেকজন প্যাসেঞ্জারকে প্রেয়সীর হুকুমে রোজ চিঠি লিখতে হত। দিনরাত্রি তার কাজ ছিল প্রেমের কবিতা পড়া আর তার বাগ্‌দত্তার কাহিনী অনর্গল বলে যাওয়া। আমাদের ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, শুনে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। একদিন বলেছিলাম যে তার প্রিয়ার মুখশ্রী গ্রীক ছাঁদের, তাতে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল।

দিন যত দীর্ঘই হোক, তারো শেষ আছে। অবশেষে টিলবারি পৌঁছনো গেল। চারদিক ভিজে, মেঘে ঢাকা আকাশ; একেবারে বিখ্যাত লণ্ডনী আবহাওয়া। কিন্তু বাইরের প্রকৃতির রূপ একঘেয়ে হলে কী হয় আমাদের সামনে এত উত্তেজনার খোরাক ছিল যে অন্যদিকে আমাদের নজরই পড়ল না। প্রথম যখন টিউব-স্টেশনে নেমে গেলাম, তখন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে স্ফূর্তির অবধি ছিল না।

পরের দিন থেকেই ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। প্রথমেই গেলাম ক্রম্‌ওয়েল রোডে ভারতীয় ছাত্রদের উপদেষ্টার কাছে। ভদ্রলোকের ব্যবহারটি মধুর, নানা উপদেশও তাঁর কাছে মিলল, কিন্তু কেম্ব্রিজে ঢোকা সম্বন্ধে তিনি আশ্বাস দিতে নারাজ। ভাগ্যক্রমে কেম্ব্রিজের কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে ওখানেই দেখা হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিল যে ক্রম্‌ওয়েল রোডে সময় নষ্ট না করে সোজা কেম্ব্রিজে গিয়ে চেষ্টাচরিত্র করাই ভালো। পরের দিনই কেম্ব্রিজে হাজির হলাম।

কয়েকজন উড়িষ্যার ছেলেকে অল্পস্বল্প চিনতাম, তাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে একজন ফিজউইলিয়াম হল্‌এর ছেলে (এস. এম. ধর) আমাকে তাদের সেন্সর, রেডেওয়ে সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। রেডেওয়ে অতি সহৃদয় ব্যক্তি, ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে আমার বক্তব্য শুনলেন, অবশেষে জানালেন যে সোজাসুজি আমাকে ভরতি করে নেওয়াই তাঁর অভিপ্রায়। ভরতির সমস্যা চুকে যেতে প্রশ্ন উঠল টার্মের। চলতি টার্ম শুরু হয়ে গেছে দু সপ্তাহ আগে, যদি সেটা আমি ধরতে না পারি তো ডিগ্রি পাবার জন্য অতিরিক্ত এক বৎসর এখানে কাটাতে হবে। নতুবা আমার ডিগ্রি

পাবার সময় জুন ১৯২১। কিন্তু এ বিষয়েও রেডেওয়ে সাহেব সাহায্য করলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। কয়লাখনির ধর্মঘট ও আমার মিলিটারি শিক্ষা ইত্যাদির কথা তুলে তিনি কর্তৃপক্ষকে নরম করে আনলেন। ফলে সে টার্মেই আমি ভরতি হলাম। রেডেওয়ের সাহায্য ভিন্ন যে বিলেতে বসে কী করতাম জানি না।

২৫শে অক্টোবর লণ্ডনে পেঁছিই, কিন্তু কেম্ব্রিজে গুছিয়ে বসতে বসতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ গড়িয়ে গেল। আমাকে যেসব বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতে হত তার সংখ্যা ছিল অত্যধিক কারণ মেণ্টাল এণ্ড মরাল সায়ান্সেস ট্রাইপস ছাড়াও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ক্লাস ছিল। বক্তৃতার সময়ের বাইরে যথাসাধ্য পড়াশুনো করতে হত। কোনো স্ফূর্তির অবকাশ ছিল না, এক পরিশ্রমের মধ্যেই যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু ছাড়া। সেকালের সিভিল সার্ভিসের নিয়মানুসারে আমাকে আট নয়টি পৃথক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে, তার মধ্যে কয়েকটি আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আমার পাঠ্যতালিকায় ছিল ইংরিজি রচনা, সংস্কৃত, দর্শন, ইংরিজি আইন, রাষ্ট্রনীতি, আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল। এসব বিষয়ে পড়াশোনা ছাড়া সার্ভে করা ও ম্যাপ তৈরি (কার্টোগ্রাফি) ছিল ভূগোলের অন্তর্গত, এবং আধুনিক য়ুরোপ পড়তে গিয়ে কিছুটা ফরাসীও আয়ত্ত করতে হত।

মেণ্টাল এণ্ড মরাল সায়ান্সেস ট্রাইপস-এর কাজটা আমার ভালো লাগত বেশি, কিন্তু বক্তৃতায় যোগ দেওয়া ছাড়া ও বিষয়ে অগ্রসর হবার উপায় ছিল না। বক্তৃতা দিতেন প্রোফেসর সর্‌লে (এথিক্‌স), প্রোফেসর মায়ার্স (সাইকলজি) ও প্রোফেসর ম্যাকটেগার্ট (মেটাফিজিক্স)। প্রথম তিন টার্ম প্রায় সমস্ত সময়টাই খরচ হত সিভিল

সার্ভিস পরীক্ষার জন্য। অবসর-বিনোদনের জন্য ইণ্ডিয়ান মজলিস ও ইউনিয়ন সোসাইটির সভায় যেতাম।

যুদ্ধোত্তর কেম্ব্রিজের মনোভাব ছিল নিতান্ত গোঁড়া। অক্সফোর্ড সবেমাত্র উদারনৈতিক হতে শুরু করেছে। আবহাওয়ার রকম সহজেই বোঝা যেত প্যাসিফিস্ট, সোশ্যালিস্ট, কনসিয়েন্সস অবজেক্টরস প্রভৃতির প্রতি ছাত্রদের অভ্যর্থনায়। কেম্ব্রিজে কোনো সভাসমিতি করে বক্তৃতা দেওয়া তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটরা এসে মিটিং ভেঙে দিত, বক্তামশাইকে ময়দা দিয়ে স্নান করাত, জলে চোবাত। এই 'র‍্যাগিং' ছিল আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের আমোদ-প্রমোদের অন্তর্গত, আমার তাতে যথেষ্ট সমর্থন ছিল। কিন্তু বক্তার সঙ্গে মত মেলে না বলেই মিটিং ভেঙে ফেলা আমি সমর্থন করতে পারতাম না। আমার মতো বিদেশীকে যে জিনিসটা মুগ্ধ করেছিল সেটা হচ্ছে ছাত্রদের স্বাধীনতা ও সম্মান। এই সম্মানের প্রভাব ছাত্রদের চরিত্রে গভীরভাবে পড়ত। পুলিশ-বোঝাই কলকাতা শহরে সন্দেহভাজন ভাবী বিপ্লবীদের অবস্থা থেকে কী পরিবর্তন! কেম্ব্রিজের আবহাওয়ায় বাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য কারণ এখানে অধ্যাপক ছাত্রের উপর অত্যাচার করা দূরে থাকুক, আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদেরই অধ্যাপকদের উপর অত্যাচার করার সম্ভাবনা বেশি। 'ডন'দের মধ্যে যাঁদের জনপ্রিয়তা কম তাঁদের প্রায়ই আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত, তাদের ঘরবাড়ি লুটপাট হত। অবশ্য এসবের মধ্যে কোনো শত্রুতার ভাব ছিল না। কারণ জিনিসপত্রের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ করে দিত ছাত্রেরাই। এমন কি কেম্ব্রিজের রাস্তায় ঘাটে যখন এই 'র‍্যাগিং'এর উল্লাস,

জনসাধারণের সম্পত্তি যখন ধ্বংস হচ্ছে, তখনও পুলিশ যেমন সংযত ব্যবহার করত তেমন ভারতবর্ষে কল্পনা করা অসম্ভব।

বৃটেনে লালিত ইংরেজ সন্তানের চেয়ে কেম্ব্রিজে স্বাধীনতার মাত্রা দেখে আমি বেশি মুগ্ধ হব তাতে আর বিচিত্র কী। বিচিত্র যেটা লাগত সেটা হচ্ছে ছাত্রদের সম্বন্ধে চারদিকে সকলের শ্রদ্ধা এবং বিবেচনা। কেম্ব্রিজে পা দেওয়া মাত্র যে কোনো নতুন ছাত্র বুঝতে পারত যে চরিত্রের, ব্যবহারের অতি উঁচু মান তার কাছে সবাই প্রত্যাশা করছে। প্রত্যাশার চাপে ব্যবহারও সুগঠিত হত। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি এই বিবেচনার ভাব কেবল কেম্ব্রিজের একচেটিয়া নয়, সারা দেশেই কমবেশি মাত্রায় এর চল ছিল। ট্রেনে কেউ জিগগেস করলে উত্তরে আপনি যখনি বলবেন যে আপনি কেম্ব্রিজে (বা অক্সফোর্ডে) আছেন তখনই তার ধরন-ধারন বদলে যাবে। বন্ধুভাব তো আসবেই, শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠবে। অন্তত এই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ-ওয়ালাদের মধ্যে যেটুকু ঠাট-ঠমকের ভাব থেকে থাকে তার পক্ষপাতী আমি নই। কিন্তু পুলিশ-ঘেরা আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে ছাত্র ও তরুণদের আরো স্বাধীনতা দেওয়া, তাদের প্রতি বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করার স্বপক্ষে অনেক কিছু বক্তব্য আছে।

কলকাতায় থাকতে একটি ঘটনা ঘটেছিল যা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নতুন বই কেনার প্রতি আমার তখন প্রবল ঝোঁক ছিল। নতুন বই দেখবামাত্র অস্থির হয়ে উঠতাম, হাতে না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ফিরতে পারতাম না। একদিন কলেজ স্ট্রিটের একটা বড় দোকানে গিয়ে দর্শনের একখানা বইএর খোঁজ করছি (তখন দর্শনের উপর খুব ঝোঁক ছিল), দামটা যখন শুনলাম তখন পকেটে হাত দিয়ে

দেখি কয়েক টাকা কম আছে। ম্যানেজারকে বললাম বাকি টাকাটা কাল দিয়ে দেব, বইটা আমাকে দিন। উত্তর পেলাম যে তা সম্ভব নয়, পুরো দামটা একসঙ্গে আগে দিতে হবে, তারপর অন্য কথা। বইটা না পেয়ে শুধু যে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম তা নয়, আমাকে এভাবে অবিশ্বাস করাতে মনে অত্যন্ত আঘাত লেগেছিল। কেম্ব্রিজে যে-কোনো দোকানে যাও, যা খুশি হুকুম কর, 'ফেল কড়ি মাখ তেলে'র কোনো বালাই নেই। আরো একটি জিনিস আমার মনকে টেনেছিল—সে হচ্ছে ইউনিয়ন সোসাইটির সভায় বিতর্ক। তার হাওয়ায় যেন কিসের জ্বালা ছিল। যা খুশি বলার, যাকে খুশি আক্রমণ করার অবাধ স্বাধীনতা। অনেক সময় পার্লামেণ্টের প্রধান সভ্যেরা, এমন কি মন্ত্রীমহাশয়রাও, ছাত্রদের সঙ্গে সমান হয়ে বিতর্কে নামতেন। বলা বাহুল্য তাঁদের কপালে প্রায়ই জুটত কঠোর সমালোচনা, আক্রমণ, লাঞ্ছনা। হোরেশিও বটম্‌লে এম. পি. একবার এক বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন। বিপক্ষের বক্তা তাঁকে এই বলে সাবধান করেছিলেন: "দেয়ার আর মোর থিংস্‌ ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, হোরেশিও, দ্যান ইওর জন বুল ড্রিম্‌স অফ।" প্রখর কৌতুকে এক একদিন বিতর্কসভা মাতোয়ারা হয়ে উঠত। আয়র্লণ্ড সম্পর্কে এক বিতর্কের সময় একদিন এক আইরিশ-সমর্থক সরকারের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে বললেন: "ফোরসেস অফ ল অ্যাণ্ড 'অর্ডার অন ওয়ান সাইড অ্যাণ্ড বনার ল অ্যাণ্ড ডিসঅর্ডার অন দি আদার।"

বিতর্কসভার অতিথিদের মধ্যে পার্লামেণ্টের বিখ্যাত সদস্যেরা ছাড়া ভাবী রাজনৈতিকেরাও থাকতেন। যেমন ডক্টর হিউ ড্যালটনকে প্রায় এসব সভায় দেখা যেত। তখনো তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য হননি। ভবিষ্যতে হবার আশায় কোনো কন্‌স্টিটুয়েন্সির সেবাযত্নে নিযুক্ত

আছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক বিতর্কে স্যর অসওয়াল্ড মস্‌লে (তখন বামপন্থী লিবারেল বা শ্রমিকদলীয়) যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ডায়ার-ও'ডায়ারের নীতিকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিলেন এবং সমগ্র ব্রিটেনে চাঞ্চল্য এনেছিলেন এই বলে যে ১৯১৯ সালের (তারপর তাঁর ভোল কী রকম বদলেছে সেটা সকলেই জানেন) অমৃতসরের ঘটনা জাতিগত বিদ্বেষের পরিচায়ক। গিল্ডহলে কেম্ব্রিজবাসীদের খনিমজুরদের অবস্থা বোঝাতে এলেন স্যর জন সাইমন ও মিস্টার ক্লাইন্‌স্‌। স্যর সাইমনকে কিঞ্চিৎ মজা দেখাবার জন্য আণ্ডারগ্র্যাডরা ভিড় করে এসেছিল। তিনি সহজে পার পেলেন না বলাই বাহুল্য। কিন্তু ক্লাইন্‌স (বোধ হয় নিজেই এক সময় খনি-মজুর ছিলেন) এমন আন্তরিকতা ও আবেগের সঙ্গে বক্তৃতা করলেন যে যারা ব্যঙ্গ করতে এসেছিল তারাও শেষ পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ল। যে ছয় টার্ম আমি কেম্ব্রিজে ছিলাম তার মধ্যে ব্রিটিশ ও ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্ক ভালোই ছিল কিন্তু বন্ধুত্বের স্তরে খুব কমই উঠেছে। শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকেই একথা বলছি। এর মূলে ছিল একাধিক কারণ। যুদ্ধের প্রভাব ছিল অবশ্যই, তাছাড়া ছিল সাধারণ ব্রিটিশের ব্যবহারের বাহ্য রঙচঙের আড়ালে প্রচ্ছন্ন একটা শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার। আর আমরা যুদ্ধপরবর্তী ঘটনাবলী, বিশেষত অমৃতসরের বিপর্যয়ের পর আত্মসম্মান ও জাতীয় সম্মান সম্বন্ধে স্বভাবতই একটু সজাগ (হয়তো একটু অতিরিক্ত সজাগ) ছিলাম। মধ্যবিত্ত ইংরেজ মহলে জেনারেল ডায়ারের প্রতি সহানুভূতি দেখে আরো দুঃখ হত। মোটের উপর বোধ হয় বৃটিশ ও ভারতীয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের কোনো ভিত্তি ছিল না। রাষ্ট্রনীতিক দিক দিয়ে আমরা পূর্বের চেয়ে অনেক সজাগ, অনেক

অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম। কাজেই ভারতীয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের গোড়ার কথা ছিল তার ধ্যানধারণার প্রতি সহানুভূতি, অন্তত সহিষ্ণুতা। এ দুটি জিনিস মেলা সহজ ছিল না।

রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে কেবল শ্রমিকদলই ছিলেন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল। কাজেই শ্রমিকদলীয় বা ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গেই বন্ধুত্বের সম্ভাবনা ছিল বেশি।

অবশ্য এটা হল মোটামুটি কথা এবং এর বহু হেরফের শুধু সম্ভব নয়, আমার জীবনে অনেক ঘটেছে। ছাত্রদের মধ্যে, ছাত্রসমাজের বাইরে বহু রক্ষণশীল লোকেদের সঙ্গে আমার বন্ধুতা সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়েও অব্যাহত রয়েছে। আমার মতামতের প্রতি তাদের যথেষ্ট সহিষ্ণু মনোভাব থাকার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। গত কিছুকাল ধরে, বিশেষত গত পাঁচ বৎসরে বৃটিশ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা বিপ্লবের ঝড় বয়ে গেছে। তার ঝাপটা লেগেছে কেম্ব্রিজে, লণ্ডনে অক্সফোর্ডে ও অন্য সর্বত্র। তাই হয়তো আমার ১৯১৯-২০ সালের অভিজ্ঞতা আজকের থেকে অন্যরকম।

যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী সময়ের ইংরাজি মেজাজকে যে আমি ভুল বুঝিনি তার প্রমাণ দিতে পারি কয়েকটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে। প্রায়ই শোনা যায় যে সাধারণ ইংরেজের একটা ন্যায় অন্যায়ের বোধ আছে, খেলোয়াড়ী মনোভাব আছে। আমরা যখন কেম্ব্রিজে ছিলাম তখন ভারতীয় ছাত্রেরা এই মনোভাবের আরো কিছু প্রমাণ পেলে খুশি হত। সে বছর টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল একটি ভারতীয় ছাত্র, নাম সুন্দর দাস. ব্লু-ও পেয়েছিল স্বভাবতই। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে ইণ্টার-ভারসিটি খেলাগুলোতে তাকেই ক্যাপ্টেন করা হবে। কিন্তু সেটা এড়াবার জন্য একজন পুরনো ব্লু'কে এনে একবছর

তাকেই চালিয়ে যাবার ভার দেওয়া হল। কাগজপত্রে এতে কিছু দোষ দেবার নেই। টীমের ক্যাপ্টেন হবার জন্য পুরনো ব্লু'র দাবিটা ন্যায্য, কিন্তু পর্দার আড়ালে কী ঘটে গেল সেটা আমরা যথেষ্ট জানতাম এবং আমাদের দলে নীরব ঘৃণার ও রাগের কিছুমাত্র অভাব ঘটেনি।

আরেকটা উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। একদিন নজর পড়ল আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর-এ ভরতি হবার জন্য আবেদনপত্র চেয়ে এক নোটিশের উপর। আমাদের মধ্যে কয়েকজন আবেদন করল। উত্তরে শুনলাম যে আমাদের বিষয়ে উপর-ওয়ালার পরামর্শ নেওয়ার দরকার পড়েছে। কিছুদিন পরে এই মর্মে চিঠি পেলাম যে ইণ্ডিয়া অফিস নাকি আমাদের ভরতির ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। এই নিয়ে ভারতীয় মজলিশে তুমুল আলোচনা উঠল, ঠিক হল ভারতসচিবের সঙ্গে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করতে হবে এবং দরকার হলে কে. এল. গাউবা ও আমার এ বিষয়ে ভারত-সচিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার অধিকার থাকবে। তখনকার ভারতসচিব ঈ. এস. মণ্টাগু আমাদের পাঠালেন সহকারী ভারতসচিব আর্ল অফ লিটনের কাছে। লিটন আমাদের সমাদর করে বসালেন, মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনলেন, বললেন যে আপত্তিটা আদৌ ইণ্ডিয়া অফিসের নয়, ওয়ার অফিসের। সেখানে খবর গিয়েছিল যে ভারতীয়েরা ও. টি. সি.তে ভরতি হলে সেটা ইংরেজ ছাত্রদের সহ্য হবে না। তাছাড়া আরো মুশকিল এইখানে যে ও. টি. সি. থেকে যারা উত্তীর্ণ হয় তারা বৃটিশ সেনাদলে অফিসার পদের অধিকারী। ভারতীয়েরা ও. টি. সি.তে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে যদি বৃটিশ সৈন্যদলে অফিসার পদ দাবি করে বসে তবে একটা বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হবে এটাও ওয়ার অফিসের অন্যতম চিন্তার বিষয়। লর্ড লিটন

ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে ভবিষ্যতে মিশ্র বাহিনীরও নায়কত্ব আসবে ভারতীয়দেরই হাতে কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাবটা অনেক ইংরেজ মহলে অতি প্রবল, তাকে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। উত্তরে আমরা জানালাম যে আমরা বৃটিশ সেনাদলে কমিশন চাই না এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী আছি, আমাদের লক্ষ্য পেশাদার সৈন্যদলে যোগ দেওয়া নয়, শিক্ষাটাই আমাদের কাম্য। কেম্ব্রিজে ফিরে গিয়ে আবার ও. টি. সি.র কর্তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলাম। শুনলাম আপত্তিটা নাকি ওয়ার অফিসের নয়, ইণ্ডিয়া অফিসেরই। আসল ব্যাপার যাই হোক না কেন, কোনো কোনো ইংরেজ মহলে ভারতীয়-বিদ্বেষ কী রকম প্রবল তার একটা নমুনা পাওয়া গেল। আমি যতদিন ছিলাম ততদিনের মধ্যে উপরওয়ালারা আমাদের দাবিতে কর্ণপাত করেননি এবং আমার ধারণা সতের বছর আগে যে অবস্থা ছিল তার কিছুমাত্র বদল হয়নি।

মোটের উপর তখনকার দিনে ভারতীয় ছাত্রেরা কেম্ব্রিজে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিত, বিশেষত লেখাপড়ার ক্ষেত্রে। খেলাধুলোয়ও তাদের স্থান অগৌরবের ছিল না। নৌকোচালানোর ব্যাপারে ভারতীয়দের আরেকটু কৃতিত্ব দেখতে পেলে খুশি হতাম। ভারতবর্ষে বাচখেলা ক্রমশ যেরকম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে মনে হয় যে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারেও ভারতীয় ছাত্রেরা গৌরব অর্জন করবে।

প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো উচিত কি না এবং পাঠালে কোন বয়সে পাঠানো উচিত। ১৯২০ সালে লর্ড লিটনের গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় ছাত্রদের অবস্থা আলোচনার জন্য এক সরকারী কমিটির বৈঠক বসেছিল এবং এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনাও হয়। আমার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে এই যে ভারতীয়

ছাত্রদের খানিকটা পরিণত হবার আগে বিদেশে যাওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ বি. এ. পাশ করার পর যাওয়াই ভালো। তা নইলে বিদেশে শিক্ষার সুযোগকে তারা সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পারবে না। উপরোক্ত ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টস কমিটিতে আমি যখন কেম্ব্রিজ ভারতীয় মজলিশের পক্ষ থেকে যাই তখনও একথাই বলেছিলাম। বৃটিশ পাবলিক স্কুলের শিক্ষা সম্বন্ধে চারদিকে অজস্র প্রশংসা শোনা যায়। বৃটিশ জনসাধারণ বা বৃটিশ ছাত্রদের উপর এই শিক্ষার কী ফল হয় তা বিচার করতে চাই না। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের বেলায় যে ফলটা হয় সেটা যে আদৌ প্রীতিকর নয় তা জোর করে বলতে পারি। কেম্ব্রিজে বিলিতি পাবলিক স্কুল বৃক্ষের কয়েকটি ফলের সংস্পর্শে এসেছিলাম, তাদের মোটেই তেমন উচ্চশ্রেণীর জীব মনে হয়নি। যারা বাপমায়ের সঙ্গে বাস করে, স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির শিক্ষাটাও পায় তাদের অবস্থা একলা-পড়তে-আসা ছেলেদের চেয়ে শতগুণে ভালো। গোড়ার দিকে শিক্ষাকে হতে হবে "জাতীয়", তার শিকড় থাকা চাই দেশের জমির ভিতর। মনের পুষ্টিটা ও বয়সে নিজের দেশের সংস্কৃতি থেকেই আহরণ করা দরকার। চারাগাছকে উপযুক্ত সময়ের আগেই অন্য জমিতে চালান করলে সে বাঁচে কেমন করে? না, অল্প বয়সে কাঁচা ছেলেমেয়েদের বিদেশে স্কুলে পাঠানো মোটেই উচিত নয়। শিক্ষা বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে কেবল উপরের স্তরে এসে। তখনই ছাত্র দূরদেশে গিয়ে জ্ঞান আহরণের উপযুক্ত হয়, পূর্ব-পশ্চিম মিলতে পারে, পরস্পরের উপকারে লাগতে পারে।

ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসের সভ্যদের এককালে বলা হত 'সবজান্তা'। এর কিছুটা সার্থকতা ছিল কারণ সবরকম কাজেই তাদের নিযুক্ত করা হত। যে শিক্ষা তারা পেত তাতে খানিকটা নিজেকে অদল-

বদল করে নেবার ক্ষমতা জন্মাত, নানা বিষয়ে অল্প অল্প জানার দরুন শাসনকার্যে সুবিধাও মিলত কিছুটা। ন'টা বিষয়ে যখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বসলাম তখন একথা হাড়ে হাড়ে বুঝতে হয়েছিল। তার মধ্যে সবকিছু আমার পরবর্তী জীবনে কাজে লাগেনি কিন্তু রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইংলন্ডের ইতিহাস, আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাস যে উপকারী হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষত আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়বার আগে পর্যন্ত মহাদেশীয় য়ুরোপের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিছুই বুঝিনি। আমরা ভারতীয়রা যে শিক্ষা পাই তাতে য়ুরোপ হচ্ছে গ্রেট ব্রিটেনেরই বৃহৎ সংস্করণ মাত্র। ফলে য়ুরোপকে বৃটেনের চোখ দিয়ে দেখবার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে এসে পড়ে। এটা অবশ্যই বিরাট ভুল, কিন্তু আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাস ও বিশেষত বিসমার্কের আত্মজীবনী, মেটারলিঙ্কের স্মৃতিকথা, কাভুরের চিঠিপত্র ইত্যাদি পড়বার আগে তা জানা ছিল না। কেম্ব্রিজে থাকাকালীন এই মূল বইগুলি পড়াতেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির গূঢ় ধারাকে আমি আয়ত্ত করতে শিখেছিলাম।

১৯২০ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতার পরীক্ষা শুরু হল। একমাস ধরে তার টানা হেঁচড়া চলবার পর অবশেষে যখন শেষ হল তখন শরীর মন ভেঙে পড়তে চায়। যথেষ্ট খেটেছিলাম তবু আশানুরূপ তৈরি হতে পারিনি। কাজেই বিশেষ উৎসাহিত বোধ করতে পারছিলাম না। অসংখ্য কৃতী ছাত্র বহু বছরের প্রস্তুতির পরও এ পরীক্ষায় ডুবেছে, কাজেই তেমন উৎসাহিত হতে হলে বেশ খানিকটা অহঙ্কার দরকার। সংস্কৃত পরীক্ষায় যখন নিশ্চিত ১৫০ মার্ক বোকামি করে হারালাম তখন আশঙ্কার কারণটা আরো বাড়লো। ইংরিজি থেকে সংস্কৃত অনুবাদের

পেপার, লেখাটাও আমার ভালোই হয়েছিল। পরে ভালো করে নকল করব মনে করে প্রথমে কাটাকাটি করে একটা খাড়া করেছিলাম। কিন্তু সময়ের হিসেবটা এমন নির্বিবাদে ভুলে গিয়েছিলাম যে যখন ঘণ্টা পড়ল তখন অর্ধেকের বেশি নকল করা বাকি। কিন্তু তখন কোনো উপায় নেই—খাতার মায়া ত্যাগ করে বসে আঙুল কামড়ানো ছাড়া আর উপায় রইল না।

সকলকে জানালাম যে পরীক্ষা ভালো দিতে পারিনি, প্রথম ক'জনের মধ্যে স্থান পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ট্রাইপসের পড়াশুনোর দিকে মন দেওয়া সাব্যস্ত করলাম। কাজেই যেদিন রাত্রে লণ্ডনে বসে এক বন্ধুর টেলিগ্রাম পেলাম—"অভিনন্দন জানাচ্ছি, মর্নিং পোস্ট দেখো"—সেদিন কেমন আকাশ থেকে পড়েছিলাম তা কল্পনা করা শক্ত নয়। কী মানে বুঝে পেলাম না। সকালে উঠেই এক কপি মর্নিং পোস্ট জোগাড় করে দেখি আমি চতুর্থ হয়েছি। আনন্দের অবধি রইল না। দেশে এক কেব্‌ল চলে গেল তৎক্ষণাৎ।

এবার এক নতুন সমস্যা উদয় হল। এই চাকরি নিয়ে কী করি? সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে মোটা মাইনের গদিতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে জীবন কাটিয়ে দেব? নতুন কিছু নয়, পুরনো কাহিনী। তরুণ বয়সে বড়ো কথা বলে অনেকেই, বয়স হলে কাজ করে অন্যরকম। কলকাতার একটি ছেলেকে চিনতাম যার মুখে কলেজ-জীবনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী ছাড়া অন্য কথা শোনা যেত না, পরবর্তী জীবনে সে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছে, এখন সিভিল সার্ভিসের মস্ত কর্ণধার। বোম্বাই-এর এক বন্ধু লোকমান্য তিলকের উপস্থিতিতে শপথ করেছিল যে আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করলে চাকরি ছেড়ে দেশের কাজে নামবে। কিন্তু জীবনের শুরুতেই আমি

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে বাঁধা সড়কে চলব না; তাছাড়া বহুকালের আদর্শ ছিল, যেগুলিকে চিরকাল আঁকড়ে ধরে থেকেছি, আজ চাকরি নিলে সেগুলিকে জীবন থেকে বিদায় দিতে হয়।

কিন্তু ইস্তফা দেবার আগে দুটো জরুরি কথা ভাববার ছিল। এক, লোকে কী ভাববে? দুই, আজ ঝোঁকের মাথায় চাকরি না নিয়ে, পরে আবার পস্তাতে না হয়। ঠিক কাজ করছি কি না সে বিষয়ে আমি কী সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ?

মনস্থির করতে দীর্ঘ সাতমাস লেগে গেল। ইতিমধ্যে মেজদার সঙ্গে চিঠিপত্র চলতে লাগল। সৌভাগ্যের বিষয় আমার চিঠিগুলি মেজদা সযত্নে তুলে রেখেছিলেন। আমি যেগুলি পেয়েছিলাম সেগুলি রাষ্ট্রনীতির ঝড়ঝাপ্‌টার মধ্যে কোথায় উড়ে গেছে জানি না। আমার মনের অবস্থার সংকেত হিসেবে আমার চিঠিগুলির মূল্য আছে।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আই. সি. এস. পরীক্ষার ফল বেরুলো। কয়েকদিন পরে এসেক্স-এ লী-অন-সীতে ছুটি উপভোগ করতে এসে মেজদাকে ২২শে সেপ্টেম্বর লিখলাম:

"আপনার অভিনন্দনসূচক পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। জানি না আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করিয়া আমার কী তেমন লাভ হইয়াছে, কিন্তু এই খবরে যে সকলে খুশি হইয়াছেন এবং পিতামাতার মন এই দুর্দিনে একটু হাল্কা হইয়াছে ইহাতেই আমার আনন্দ।

"আমি এখানে বেট্‌স্‌ সাহেবের অতিথিরূপে বাস করিতেছি। বেট্‌স্‌ সাহেবের মধ্যে ইংরাজ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই। ভদ্রলোক মার্জিত, মতামতে উদার, ভাবে সর্বদেশিক। রুশ, পোলাণ্ডবাসী,

লিথুনীয়, আয়র্লণ্ডীয় ও অন্যান্য বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে তাঁহার আনাগোনা। রাশিয়ান, আইরিশ ও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহার প্রচুর উৎসাহ, রমেশ দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁহার গভীর অনুরাগ।...

প্রতিযোগিতায় চতুর্থ হওয়ার জন্য আমি রাশিকৃত অভিনন্দন পাইতেছি। তবু আই. সি. এস. গোষ্ঠীতে প্রবেশ করার চিন্তায় কিছুমাত্র আনন্দ পাইতেছি একথা বলা চলে না। যদি এই চাকুরিতে যোগ দিতে হয় তবে এ পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করিতে যেরূপ অনিচ্ছা লইয়া বসিয়াছিলাম সেরূপ অনিচ্ছার সঙ্গেই তাহা করিতে হইবে। চাকুরিজীবনে মোটা মাহিনা ও তাহার পর মোটা পেনসন আমার বরাদ্দ থাকিবে তাহা জানি। দাসত্বে যদি যথেষ্ট কুশলতা অর্জন করি তো একদিন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হইবার আশাও রাখা চলে। যোগ্যতা থাকিলে, গোলামিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে হয়ত চীফ্ সেক্রেটারি হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু চাকুরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? চাকুরিতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাইবে কিন্তু সেটা কী আত্মার মূল্য দিয়াই ক্রয় করিব? আমার মনে হয় আই. সি. এস. গোষ্ঠীর কোনো লোককে চাকুরির আইনকানুনকে যেভাবে মাথা নিচু করিয়া মানিয়া লইতে হয় তাহার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শকে মানাইয়া লইবার চেষ্টা ভণ্ডামি ভিন্ন কিছু নয়।

"সাধারণ লোকের কথায় যাহাকে বলে জীবনে উন্নতি করা তাহার তোরণে দাঁড়াইয়া আমার মনের অবস্থা কী হইয়াছে তাহা আপনি নিশ্চয় বোঝেন। এ চাকুরির স্বপক্ষে বলিবার অনেক কিছু আছে। প্রত্যহ অগণ্য লোকে হাবুডুবু খাইতেছে যে অন্নের চিন্তায় সেই অন্নচিন্তা ইহাতে চিরকালের জন্য মিটিয়া যাইবে। জীবনের সম্মুখে

দাঁড়াইয়া সাফল্য অসাফল্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, সংশয় নাই। কিন্তু আমার মত মনোবৃত্তির লোক, যে চিরকাল 'উদ্ভট' জিনিসেরই পূজা করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে স্রোতে গা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় নহে। সংগ্রাম ভিন্ন, বিপদ ভিন্ন জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহার অন্তরের মধ্যে সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দংশন নাই তাহার নিকট জীবনের সংশয়, বিপদ ততটা ভয়াবহ নহে। তাহার উপর, একথা ঠিক যে সিভিল সার্ভিসের শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া দেশের সত্যকারের কাজ করা চলে না। এক কথায় সিভিল সার্ভিসের আইনকানুনের প্রতি ভক্তি রাখার সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলে না।

"আমি বুঝিতেছি যে এসব কথা বলিয়া কোনো ফল নাই কারণ আমার ইচ্ছায় কিছু হইবে না। সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে আপনার কোনো মোহ নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার চাকুরি ছাড়ার কথাতে পিতৃদেব যে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

"সুতরাং দেখিতেছি যে অর্থনৈতিক কারণে ও স্নেহের বন্ধনের ফলে আমার ইচ্ছাকে আদৌ আমার বলিয়া দাবি করিতে পারি না। কিন্তু একথা বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে আমার ইচ্ছাই যদি চূড়ান্ত হইত তবে সিভিল সার্ভিসে আমি কখনোই যোগ দিতাম না।

"আপনি হয়ত বলিবেন যে এ চাকুরি এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহার পাপকে দূর করাই উচিত, এবং সে কথা বলিলে অবশ্যই অন্যায় বলা হইবে না। কিন্তু যদি তাহাই করি তা হইলেও যে-কোনোদিন অবস্থা এমন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইতে

পারে যে ইস্তফা দেওয়া ভিন্ন আমার গত্যন্তর থাকিবে না। আগামী পাঁচ দশ বৎসরের মধ্যে যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা হইলে জীবনে নতুন করিয়া পথ করিয়া লইবার উপায় থাকিবে না। সেক্ষেত্রে আজ আমার সম্মুখে নানা পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে।

"সন্দেহবাদী লোকে বলিবে যে চাকুরির প্রশস্ত কোলে একবার ঠাঁই করিয়া লইবার পর আমার সমস্ত তেজ উবিয়া যাইবে। কিন্তু এই ক্ষয়কারী প্রভাব আমার উপর কিছুতেই পড়িতে দিব না এ বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি বিবাহ করিব না, সুতরাং যখন যাহা সত্য বুঝিব তাহাকে পালন করার পথে সাংসারিক বিবেচনার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে না।

"আমার মনের গঠন যেরূপ তাহাতে আমার সত্যই সন্দেহ হয় যে সিভিল সার্ভিসের পক্ষে আমার যোগ্যতা আছে কি না। বরঞ্চ আমার ধারণা, যেটুকু ক্ষমতা আমার আছে তাহা অন্যভাবে আমার নিজের ও আমার দেশের উপকারে লাগাইতে পারিব।

"এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব। পিতৃদেবকে এ বিষয়ে কিছু লিখি নাই—কেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তাঁহার মত জানিতে পারিলে সুবিধা হইত।"

উপরোক্ত চিঠিতে দেখা যাচ্ছে সংগ্রাম শুরু হয়েছে কিন্তু সমাধানের কোনো নিশানা নেই। ২৬শে জানুয়ারি ১৯২১ সালে আমি আবার এ প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করলাম, লিখলাম:

"...আপনি বলিতে পারেন যে এই কুৎসিত ব্যবস্থাকে পরিহার না করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্যন্ত ইহার সহিত সংগ্রাম

করাই .আমার কর্তব্য। কিন্তু সে সংগ্রাম করিতে হইবে একাকী কর্তৃপক্ষের হুমকির মধ্য দিয়া, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলি সহ্য করিয়া, উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া। চাকুরির মধ্যে থাকিয়া এইভাবে যেটুকু উপকার করা যায় সেটুকু বাহিরে পুরাপুরি কাজে লাগার তুলনায় যৎসামান্য। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্যই সার্ভিসের আওতায় অনেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তবু আমার মনে হয় আমলাতন্ত্রের বাহিরে থাকিলে তাঁহার কাজ দেশের পক্ষে অনেক অধিক মঙ্গলজনক হইত। তাহা ভিন্ন এখানে আসল প্রশ্ন নীতির। নীতি অনুসারেই আমি এই শাসনযন্ত্রের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করিতে পারি না। গোঁড়ামিতে, স্বার্থান্ধ শক্তিতে, হৃদয়হীনতায়, সরকারী মারপ্যাঁচের জটিলতায় এই শাসনযন্ত্র বিকল, ইহার প্রয়োজনের দিন বিগত।

"আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমি দুই পথের সংযোগস্থলে উপস্থিত, মধ্যপথ আশ্রয় করিবার কোনো উপায় নাই। হয় আমাকে এই গলিত চাকুরির মায়া ছাড়িয়া সর্বান্তঃকরণে দেশের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইবে, নয় সমস্ত আদর্শ আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া সিভিল সার্ভিসের কক্ষপুটে সমাধিলাভ করাই আমার ভবিষ্য বলিয়া মানিতে হইবে। ... আমি জানি আমার এই বিপজ্জনক হঠকারিতায় আত্মীয়মহলে তুমুল সোরগোল উঠিবে।...কিন্তু তাঁহাদের মতামতে, নিন্দায় প্রশংসায় আমার কিছু আসে যায় না। আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে তাই আপনার নিকট পরামর্শ ভিক্ষা করিতেছি। পাঁচ বৎসর পূর্বে এই সময়ে আমার আরেক বিপজ্জনক প্রচেষ্টায় আপনার নৈতিক সমর্থন পাইয়াছিলাম। সে প্রচেষ্টায় আমার ভবিষ্যৎ কিছুকালের জন্য অন্ধকার বোধ হইয়াছিল, তবু আমি তাহার সমস্ত ফলকে নির্ভয়ে মাথা পাতিয়া নিয়াছিলাম, কখনো নিজের নিকটে-

অভিযোগ করি নাই, সে কথা মনে করিয়া আজো গর্ব অনুভব করিতেছি। সেই স্মৃতির কথা ভাবিয়া মনে বল পাইতেছি, আমার এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইতেছে যে আত্মত্যাগের কোনো দাবিতেই আমি পিছপা হইব না। পাঁচ বৎসর পূর্বে আপনি স্বেচ্ছায় এবং মহৎভাবে আমাকে যে সমর্থন জানাইয়াছিলেন আজও তাহা মিলিবে এ আশা কী করিতে পারি না?

"এবার পিতৃদেবকেও তাঁহার সম্মতিভিক্ষা করিয়া পৃথকভাবে লিখিলাম। আশা করি আপনি যদি আমার মত গ্রহণ করেন তবে পিতৃদেবকেও তাহাতে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিবেন। আমার স্থির বিশ্বাস এ বিষয়ে আপনার মতের বিশেষ মূল্য আছে।"

এই চিঠিতে দেখা যায় আমি সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর, কিন্তু এখনো বাড়ির নির্দেশের প্রত্যাশী।

এই বিষয়ে পরবর্তী পত্র লিখি ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১। তাতে লিখেছিলাম:

"...আমার 'বিস্ফোরক' পত্র এতদিনে বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। ঐ পত্রে আমার যে কার্যক্রমের উল্লেখ করিয়াছি পরবর্তী চিন্তার দ্বারা তাহাই দৃঢ়তর হইয়াছে।...যদি এই বয়সে চিত্তরঞ্জন সংসারের সবকিছু ছাড়িয়া জীবনের অনিশ্চয়তার ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন তবে আমার সাংসারিক সমস্যাবিহীন তরুণ জীবনে এ ক্ষমতা আরো অধিক। চাকুরি ছাড়িলেও আমার কাজের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটিবে না। শিক্ষকতা, সমাজ-সেবা, সমবায় প্রতিষ্ঠানাদি, সাংবাদিকতা, শ্রম সংগঠন, ইত্যাদি বহু কাজ রহিয়াছে যাহাতে সহস্র সহস্র কর্মঠ

তরুণকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বর্তমানে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার দিকেই আকৃষ্ট হইতেছি। ন্যাশনাল কলেজ ও নূতন সংবাদপত্র 'স্বরাজ' লইয়াই আমি এখন কিছুদিন কাটাইতে পারিব। আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তারই আকর্ষণ অধিক। তাহা ভিন্ন বিদেশী শাসকের অধীনে চাকুরি করা অতি ঘৃণ্য কাজ বলিয়া বোধ করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণার পথ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথ অপেক্ষা কণ্টকাকীর্ণ।

"দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষা করিয়া পিতৃদেব ও মাতাঠাকুরাণীর নিকট পত্র দিয়াছি। এই পথে ভবিষ্যতে লাঞ্ছনার ভয় আছে এই চিন্তায় তাঁহারা হয়ত আকুল হইবেন। আমি নিজে দুঃখ-ক্লেশের ভয় করি না, সেদিন আসিলে দুঃখ হইতে সরিয়া আসিবার চেষ্টা না করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিব।"

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯২১-এর চিঠিও কৌতূহলজনক। তার মধ্যে বলেছি:

"যেদিন আই. সি. এস. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে সেদিন হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে: যদি চাকুরিতে থাকি তাহাতে দেশের অধিক উপকারে আসিব, না চাকুরি ছাড়াটাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে। এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি জনসাধারণের মধ্যে থাকিয়াই আমি দেশের অধিক মঙ্গলসাধন করিতে পারিব, আমলাতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

নহে। চাকুরিতে থাকিয়া দেশের কোনো উপকার করা চলে না ইহা আমার বক্তব্য নহে। আমি বলিতে চাই যে তাহাতে যেটুকু মঙ্গল উপজাত হইতে পারে আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলমুক্ত দেশসেবার তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। নীতির দিকটাও এখানে দেখিতে হইবে সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। বিদেশী আমলাতন্ত্রের অধীনতাকে মানিয়া লওয়া আমার নীতিতে অসম্ভব। জনসেবার প্রথম প্রয়োজন সমস্ত সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। সাংসারিক উন্নতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিলে তবেই জাতীয় কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব। আমার মনশ্চক্ষুতে অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টান্ত সর্বদা উজ্জ্বল রহিয়াছে। ক্রমেই বোধ করিতেছি যে সেই আত্মত্যাগের দ্বারা সেই দৃষ্টান্তের দাবি মিটাইতে পারিব। আমার চতুষ্পার্শ্বিক অবস্থাও তাহার অনুকূল।"

দেখা যাচ্ছে যে তখন পর্যন্ত অরবিন্দ ঘোষের প্রভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি আবার রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ফিরে আসবেন এ ধারণা তখন চারদিকে অতি প্রবল ছিল।

এর পরের চিঠি ৬ই এপ্রিল অক্সফোর্ড থেকে লেখা। তখন আমি ছুটির সময়টা অক্সফোর্ডে কাটাচ্ছি। ততদিনে আমার পরিকল্পনাকে অগ্রাহ্য করে পিতৃদেবের চিঠি এসেছে। কিন্তু আমি তখন ইস্তফা দেওয়ার সঙ্কল্প পুরোপুরি গ্রহণ করেছি। ৬ই এপ্রিলের চিঠি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

"পিতৃদেবের ধারণা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস চাকুরিয়ার পক্ষে নব্য শাসনব্যবস্থায় জীবন মোটেই দুর্বিষহ হইবে না। দশ

বৎসরের মধ্যে এদেশে স্বায়ত্তশাসন অনিবার্য। কিন্তু আমার জীবন নব্য শাসনব্যবস্থায় সহনীয় হইবে কি না ইহা আমার জিজ্ঞাস্য নহে। অপরপক্ষে আমার ধারণা যে চাকুরিতে বহাল থাকিয়াও আমি কিছু কিছু দেশের মঙ্গলসাধন করিতে পারিব। আমার প্রধান প্রশ্ন নীতিগত। বর্তমান অবস্থায় কী আমাদের এক বিদেশী আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়া এক কাঁড়ি টাকার জন্য আত্মবিক্রয় করা সমীচীন? যাহারা ইতিমধ্যেই চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা চাকুরি গ্রহণ করা ভিন্ন যাহাদের গত্যন্তর নাই তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার অবস্থা অনেক দিক দিয়া সুবিধাজনক থাকিতে আমার কী এত শীঘ্র বশ্যতা স্বীকার করা উচিত? যেদিন আমি চাকুরির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিব সেদিন হইতে আমি আর স্বাধীন মানুষ থাকিব না ইহাই আমার বিশ্বাস।

"যদি আমরা উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি তবে দশ বৎসরে কেন তাহার পূর্বেই স্বায়ত্তশাসন আমরা অর্জন করিতে পারিব। সেই মূল্য আত্মত্যাগ ও ক্লেশবহন। কেবল এই আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের ভিত্তিতেই জাতীয় সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যদি আমরা সকলে নিজের নিজের চাকুরির খুঁটি আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকি, নিজের স্বার্থের অন্বেষণেই প্রবৃত্ত থাকি, তবে পঞ্চাশ বৎসরেও আমাদের স্বায়ত্তশাসন মিলিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব যদি না হয় অন্তত প্রত্যেক পরিবারকে আজ দেশমাতার চরণে অর্ঘ্য আনিয়া দিতে হইবে। পিতৃদেব আমাকে এই আত্মত্যাগ হইতে রক্ষা করিতে চাহেন। আমাকে আমারি স্বার্থে এই দুঃখকষ্ট হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে যে স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূল্য বুঝিব না এমন নিষ্করুণ আমি নহি। তাঁহার স্বভাবতই আশঙ্কা হয় বুঝিব,

আমি তরুণসুলভ উত্তেজনায় ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস এ-বলি কাহাকে না কাহাকেও হইতেই হইবে, নতুবা উপায় নাই।

"যদি অন্য কেহ অগ্রসর হইত, তবে আমার পিছপা হইবার, অন্তত আরো খানিকটা ভাবিয়া দেখিবার কারণ বুঝিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে লক্ষণ মোটেই দেখা যাইতেছে না, অথচ অমূল্য মুহূর্তগুলি বহিয়া যাইতেছে। সমস্ত আলোড়ন সত্ত্বেও এটুকু ঠিক যে এখন পর্যন্ত একজন সিভিলিয়ানও চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া আন্দোলনে নামিতে সাহস করে নাই। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান আসিয়াছে অথচ কেহ তাহার সমুচিত জবাব দেয় নাই। আরো অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি সমগ্র বৃটিশভারতের ইতিহাসে একজন ভারতীয়ও স্বেচ্ছায় দেশসেবার জন্য সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে নাই। দেশের সর্বোচ্চ কর্মচারীদের নিম্নতর শ্রেণীর লোকেদের নিকট দৃষ্টান্ত দেখাইবার সময় আসিয়াছে। সরকারী উচ্চ চাকুরিয়ারা যদি বশ্যতার প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এমন কি তাহার ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করেন তাহা হইলেই আমলাতন্ত্রের যন্ত্র খানখান হইয়া যায়।

"সুতরাং এই ত্যাগ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার কোনো পথ দেখিতে পাইতেছি না। এই ত্যাগের অর্থ আমি ভালোরূপে জানি। দারিদ্র্য, দুঃখক্লেশ, কঠিন পরিশ্রম তো আছেই, আরো নানা ভোগ আছে যাহার কথা স্পষ্টভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনার পক্ষে বুঝিয়া লওয়া সহজ। কিন্তু এ ত্যাগ করিতেই হইবে, জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া করিতে হইবে। দেশে ফিরিয়া পদত্যাগ করার যে পরামর্শ আপনি দিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রথমত গোলামির প্রতীকস্বরূপ

প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করা আমার পক্ষে অতি কঠিন কাজ হইবে। দ্বিতীয়ত বর্তমানের জন্য যদি চাকুরিতে প্রবেশ করি তাহা হইলে প্রথা অনুসারে আমি ডিসেম্বর বা জানুয়ারির পূর্বে দেশে ফিরিতে পারিব না। এখন যদি পদত্যাগ করি তবে জুলাই মাসেই ফিরিতে পারিব। ছয় মাসের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিবে। ঠিক মুহূর্তে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ার ফলে আন্দোলন দমিয়া যাইতে পারে, দেরিতে সাড়া মিলিলে তাহা হয়ত ফলপ্রসূ হইবে না। আমার বিশ্বাস আরেকটি এজাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করিতে বহু বৎসর লাগিয়া যাইবে। সুতরাং বর্তমান আন্দোলনের ঢেউকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করাই সমীচীন। যদি আমাকে পদত্যাগ করিতে হয় তবে তাহা দুদিন পরে বা এক বছর পরে করিলেও আমার বা অন্য কাহারো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু দেরি করিলে আন্দোলনের পক্ষে হয়ত ক্ষতি হইতে পারে। আমি জানি যে আন্দোলনকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা আমার হাতে অল্পই, তবু যদি নিজের কর্তব্য পালনের সন্তোষ লাভ করিতে পারি তাহাও এক বৃহৎ লাভ বলিতে হইবে।...যদি কোনো কারণে পদত্যাগ সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করি তবে পিতৃদেবের নিকট তৎক্ষণাৎ তার পাঠাইব, তাহাতে তাঁহার আশঙ্কা ঘুচিবে।"

কেম্ব্রিজ থেকে ২০শে এপ্রিলে লিখিত চিঠিতে বলেছিলাম যে ২২শে এপ্রিল পদত্যাগপত্র দাখিল করব।

২৮শে এপ্রিল তারিখের চিঠিতে লিখেছিলাম:

"আমার পদত্যাগ সম্বন্ধে ফিজউইলিয়ম হলের রেডেওয়ে সাহেবের

সহিত আলোচনা হইল। আমি তাঁহার নিকট যাহা কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল। তিনি আমার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সোৎসাহে সমর্থন জানাইলেন। আমি মত পরিবর্তন করিয়াছি শুনিয়া নাকি তিনি আশ্চর্য, এমন কি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন, কারণ কোনো ভারতীয়কে নাকি তিনি এ পর্যন্ত মত পরিবর্তন করিতে দেখেন নাই। আমি তাঁহাকে বলি যে পরে আমি সাংবাদিকতাকেই আশ্রয় করিব। তাঁহার অভিমতে সাংবাদিক-জীবন সিভিল সার্ভিস অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

"এখানে আসিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব পর্যন্ত আমি তিন সপ্তাহ অক্সফোর্ডে ছিলাম। শেষ কয় মাস যে চিন্তায় আমাকে অহরহ পীড়ন করিয়াছে তাহা শুধু এই যে আমার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের মনে যাহাতে ক্লেশ হয় সেরূপ কার্য আমার করা উচিত কি না।... সুতরাং নতুন পথের কিনারায় দাঁড়াইয়া আজ আমি পিতামাতার এবং আপনার (যদিও আপনি আমি যেকোনো পথেই যাই না কেন আমার জন্য সাদর অভিনন্দন জানাইয়া রাখিয়াছেন) সুস্পষ্ট ইচ্ছার বিরোধিতা করিতে হইতেছে। সার্ভিসে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে আমার প্রধানতম যুক্তির ভিত্তি ছিল এই যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া আমাকে এমন এক বৈদেশিক আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে যাহার এদেশ শাসন করিবার বিন্দুমাত্র অধিকারকে আমি স্বীকার করি না। একবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলে আমি তিন বৎসর বা তিনদিন কাজ করি তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি বুঝিয়াছি যে আপোষে মানুষকে অপজাত করে, তাহার আদর্শকে মলিন করিয়া দেয়...সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জীবনান্তে উপাধির মুকুট পরিয়া মন্ত্রিত্বের গদিতে আসীন হইতেছেন তাহার কারণ তিনি

বার্ক বর্ণিত সুবিধাবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। ঐ দর্শন গ্রহণ করিবার মতো অবস্থা আমাদের আজো আসে নাই। আমরা জাতি গঠন করিতে আসিয়াছি, এবং হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শবাদ ভিন্ন তাহা সম্ভব নহে।...আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বৃটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিবার সময় আজ উপস্থিত। প্রতি সরকারি কর্মচারী, সে তুচ্ছ চাপরাশিই হোক বা প্রাদেশিক গভর্নরই হোক, নিজের কাজের দ্বারা কেবল বৃটিশ সরকারের বনিয়াদকে পাকা করিতেছে। সরকারের অবসান করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসা। আমি টলস্টয়ের নীতির কথা শুনিয়া বা গান্ধীর প্রচারে মুগ্ধ হইয়া একথা বলিতেছি না, নিজে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছি।...কয়েকদিন হইল আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছি। গৃহীত হওয়ার সংবাদ এখনো হস্তগত হয় নাই।
"আমার চিঠির উত্তরে চিত্তরঞ্জন সম্প্রতি দেশে যে কাজ চলিতেছে তাহার বিষয়ে লিখিয়াছেন। বর্তমানে আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মীদের অভাব সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। সুতরাং দেশে ফিরিবার পর অনেক প্রীতিপ্রদ কাজ আমার হাতের কাছে পাইব।...আর কিছু আমার বলিবার নাই। আমার হাতের কড়ি আমি ফেলিয়াছি, এখন আশা করা যাউক যে ইহা হইতে কেবল সুফলই জন্মিবে।"

১৮ই মে কেম্ব্রিজ থেকে লিখলাম:

"স্যার উইলিয়ম ডিউক আমাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে রাজী করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ বিষয়ে বড়দাদার সহিত পত্রালাপও করিয়াছেন। রবার্টস্ সাহেবও আমাকে আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ইণ্ডিয়া অফিসের

নির্দেশ অনুসারে তাঁহার এই হস্তক্ষেপ। আমি স্যর উইলিয়মকে জানাইয়াছি যে পূর্ণ বিবেচনার পরই আমি পথ বাছিয়া লইয়াছি।"

এই চিঠির খানিকটা ব্যাখ্যা করা দরকার। আমি পদত্যাগ করবামাত্র ইণ্ডিয়া অফিসের কামরায় কামরায় শোরগোল উঠল। তৎকালীন সহকারী ভারতসচিব স্যর উইলিয়ম ডিউক আমার বাবার উড়িষ্যা-কমিশনারত্বের কালে তাঁকে চিনতেন। তিনি কালবিলম্ব না করে আমার বড়দা সতীশচন্দ্র বসুকে (তখন লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন) এ বিষয়ে জানালেন এবং বড়দার মধ্যস্থতায় আমাকে পদত্যাগ করার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিলেন। কেম্ব্রিজের অধ্যাপকেরাও আমাকে অনুরোধ করলেন। তখনকার কেম্ব্রিজের সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সম্পাদক মিস্টার রবার্টস্-এর তরফ থেকেও এক অনুরোধ এল। এত রকমের অনুরোধ উপরোধ পেয়ে কৌতুক বোধ করলাম। শেষোক্ত অনুরোধটাই তার মধ্যে সবচেয়ে মজার। ইণ্ডিয়া অফিসের দ্বারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রচারিত কতকগুলি ছাপা নির্দেশ নিয়ে একবার মিস্টার রবার্টস্-এর সঙ্গে আমার লড়াই বেধেছিল। এই নির্দেশপত্রের নাম ছিল "ভারতবর্ষে ঘোড়ার যত্ন করার নিয়ম" এবং তাতে এই ধরনের মন্তব্য ছিল যে ভারতবর্ষে সহিসেরা ঘোড়ার খাদ্যই খায়, ভারতবর্ষের বানিয়ারা (ব্যবসায়ীরা) জোচ্চুরির জন্য বিখ্যাত, ইত্যাদি। আমি এই ফতোয়া পাবামাত্র রাগে জ্বলতে জ্বলতে সহপাঠীদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। সকলে মিলে স্থির করলাম যে এইসব নির্দেশ ভুল এবং অপমানজনক, অতএব সকলে মিলে যুক্ত প্রতিবাদ জানাব। লিখবার সময় যখন এল তখন অবশ্য আর কেউ এগোতে চাইল না, আমি মরিয়া হয়ে নিজেই যা পারি করব স্থির করলাম...

আমার দার্শনিক প্রতীতি

১৯১৭ সালে আমার সঙ্গে এক জেস্যুইট পাদরির ঘনিষ্ঠতা হয়। উভয়ের সমজ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হত। ইগ্‌নেশিয়স লয়লা প্রবর্তিত এই জেস্যুইট পন্থার মধ্যে অনেক কিছু আমার মনকে টানত, যেমন দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা। অন্যান্য জেস্যুইটদের মতো এই পাদরির মনে কোনো গোঁড়ামি ছিল না, হিন্দুশাস্ত্রেও তাঁর দখল ছিল। আমাদের আলাপ-আলোচনায় তিনি স্বভাবতই জেস্যুইটপন্থী খৃস্টধর্মের পক্ষ থেকে কথা বলতেন, আমি দাঁড়াতাম শংকরাচার্যের বেদান্ত মতের দিকে। আমি শংকরের মায়াবাদের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতাম না, কিন্তু মোটামুটি কথাটা বুঝতাম, অন্তত তখন মনে করতাম যে বুঝি। একদিন তর্কের মধ্যে পাদরি আমার দিকে ফিরে বললেন, "শংকরের বিচার ন্যায়ের দিক থেকে চূড়ান্ত তা মানি, কিন্তু অত উঁচু ভিত্তিতে জীবনকে তোলবার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের জন্য আমরা শ্রেষ্ঠধর্মের আগের ধাপটা তৈরি করেছি।"

এক সময়ে মনে করতাম যে পরম সত্যকে মানুষের মনের দ্বারা আয়ত্ত করা যায়, শংকরের মায়াবাদই সমস্ত জ্ঞানের মূল। আজ সে কথার পুনরুক্তি করতে দ্বিধা বোধ করব। আজ আমি আর কেবল পরম

জ্ঞানের অন্বেষণে যোগ দিতে রাজী নই, আমার এমন ধর্ম চাই যাকে জীবনে পাওয়া যায়।

জীবনে যে আদর্শকে পাওয়া যায় না, বাস্তব জীবনে যার প্রয়োগ নেই, তাকে ত্যাগ করার দিকেই আমার প্রবণতা। কিছুকাল শঙ্করের মায়াবাদে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে শান্তি মিলল না, কারণ শঙ্করের তত্ত্ব জীবনে পাবার নয়। অন্য দর্শনের দিকে মুখ ফেরাতে হল। অবশ্য খৃস্টীয় দর্শনের দিকে যাবার প্রয়োজন হয়নি। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বহু ধারা আছে যেগুলি জীবনকে সার বলেই জানে, মায়া বলে মানে না। যেমন দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পরমাত্মাকে এক বলে বর্ণনা করে জগৎসংসারকে বলা হয়েছে তাঁরি প্রকাশ। রামকৃষ্ণের মতেও পরমাত্মা অর্থাৎ এক, জীবাত্মা অর্থাৎ বহু, উভয়ই স্বীকৃত হয়েছে। সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অবশ্য বহু মতের সৃষ্টি। কোনো মতানুসারে জগৎসংসার হচ্ছে আনন্দের প্রকাশ। অন্যান্য মতে সৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বরের লীলামাত্র। এক ও পরম অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃতিকে মানুষের ভাষায় ও প্রতিমায় প্রকাশ করার বহুতর চেষ্টা হয়েছে। বৈষ্ণবেরা বলেন ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। শাক্ত মতে তিনি শক্তিস্বরূপ; অন্যান্য নানা মতে তিনি জ্ঞানস্বরূপ অথবা আনন্দ-স্বরূপ। দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু দর্শনে পরমাত্মাকে সচ্চিদানন্দ বলে বর্ণনা করা চলছে। অবশ্য ন্যায়নিষ্ঠ পণ্ডিতেরা বলেন যে পরমাত্মা অনির্বচনীয়, তাঁকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। এবং জানা যায় যে পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে বুদ্ধ চিরকালই নীরব থাকতেন।

মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে পরমাত্মাকে জানা অসম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বস্তুকে আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখতে পাই না, তার সত্যকার প্রকৃতি আমরা জানি না কেননা আমাদের দৃষ্টি আমাদেরই

প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই বেকনের 'আইডোলা' বা কাণ্টের 'ফর্মস্ অফ দি অ্যাণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং'এর মতো কোনো না কোনো চশমার ভিতর দিয়েই আমরা জগৎসংসারকে দেখি। হিন্দু পণ্ডিতেরা হয়তো বলবেন যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিভক্ততা যতদিন বর্তমান থাকবে ততদিন জ্ঞানের অবিশুদ্ধতাও অনিবার্য। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় তখনি যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক চেতনার মধ্যে মিলিত হন। এই মিলন সাধারণ চেতনার ভূমিতে, মানুষের মনের ঠিকানায় ঘটা সম্ভব নয়। কেবল মনকে পেরিয়ে মহাচেতনার মধ্যেই তার উপস্থিতি। এই পরা মনের, পরা চেতনার ধারণা হিন্দু দর্শনের এক বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্যে এর স্বীকৃতি মেলেনি। হিন্দুমতে বিশুদ্ধ জ্ঞান পাওয়া যায় যোগের মধ্য দিয়ে পরা চেতনার স্তরে আরোহণ করে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে। অাঁরি বর্গসঁ-র কাল থেকে য়ুরোপীয় দর্শনেও এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ধারণা প্রবেশ করেছে, যদিও অনেক মহলে তার প্রতি উপহাস প্রায়ই বর্ষিত হয়। কিন্তু পরামানসিক যৌগিক জ্ঞানকে মেনে নেওয়া য়ুরোপের এখনো বাকি।

যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই যে পরমাত্মাকে যৌগিক জ্ঞানের মধ্য দিয়েই জানা সম্ভব, তবু তার বর্ণনার দুরূহতাটা থেকে যায়। তা যখন করি তখন সাধারণ চেতনার স্তরেই ফিরে আসতে হয়, সাধারণ মনের সমস্ত সীমা আমাকে ঘিরে ধরে। তাই পরমাত্মার বর্ণনামাত্রই হয়ে ওঠে মানুষের প্রতিমূর্তি। মানুষের নিজ মূর্তির ছায়া যে ধারণার উপর পড়েছে তাকে কোনো মতেই বিশুদ্ধ জ্ঞান বলা চলে না।

যৌগিক বোধের মধ্য দিয়ে কি পরমাত্মাকে জানা সম্ভব? পরা মনের এমন এক স্তরে কি পৌঁছানো সম্ভব যেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হয়ে মিলে যাবে? এ বিষয়ে আমার মনোভাব হচ্ছে এক রকমের সহৃদয়

সজ্ঞেয়বাদ। একপক্ষে আমি বিশ্বাসে ভিত্তি করে কিছু ধরে নিতে রাজী নই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার চাই, অথচ পাই না। অপরপক্ষে অসংখ্য ব্যক্তি অতীতে যা পেয়েছেন বলে দাবি করেন তাকে ধোঁকাবাজি বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। উড়িয়ে দিতে হলে আরো অনেক কিছু উড়িয়ে দিতে হয়, তাতে রাজী নই। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত না নিজে পরা মনের এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করছি, ততদিন পর্যন্ত হাঁ বা না কোনোটাই বলা চলে না। সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদে আশ্রয় নিতেই হয়। অর্থাৎ আমাদের আয়ত্তে যে জ্ঞান আসে সে জ্ঞান পরম নয়, আপেক্ষিক। আমাদের যৌথ মানসিক কাঠামোর, ব্যক্তি-প্রকৃতির ও ব্যক্তির মধ্যে কালগত পরিবর্তনের প্রতি তার আপেক্ষিকতা।

একবার যদি মেনে নিই যে পরমাত্মার জ্ঞান আমাদের সীমাবদ্ধ মনের সঙ্গে আপেক্ষিক সম্পর্কে যুক্ত, তবে দার্শনিক তর্কবিচারের দায় থেকে অনেকখানি রেহাই পাওয়া যায়। আরো বোঝা যায় যে পরমাত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার প্রত্যেকটিই গ্রাহ্য হতে পারে, কারণ ভিন্নতার মূল হচ্ছে ব্যক্তিপ্রকৃতির ভিন্নতা। এমন কি মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একই ব্যক্তির জ্ঞানের তারতম্য ঘটতে পারে। নানা জ্ঞানের কোনোটিকেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বিবেকানন্দের ভাষায় "মানুষের গতি মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে নয়, সত্য থেকে আরো উচ্চতর সত্যের দিকে। সুতরাং সহিষ্ণুতার ভিত্তিটা খুবই ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমার ধারণায় যে বাস্তব ধরা দিচ্ছে সে যদি পরম না হয়ে আপেক্ষিক হয় তবেই বা তার প্রকৃতি কি? প্রথমত তার একটা নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, সে মায়ামাত্র নয়। আমার এই ধারণা

কারণবহির্ভূত ধরে-নেওয়া নয়, এর ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব, ব্যবহারিক দৃষ্টি। মায়াবাদ কার্যক্ষেত্রে অচল। আমার জীবনের সঙ্গে তাকে মেলানো চলে না যত চেষ্টাই করি (বহু চেষ্টা করেছিলাম)। সুতরাং তাকে বর্জন করা ভিন্ন উপায় কি? অপরপক্ষে জীবন যদি বাস্তব এবং সত্য হয় (পরম নয় আপেক্ষিক অর্থে) তবে জীবনের অর্থ হয়, উদ্দেশ্য হয়, জীবনকে ভালো লাগে।

দ্বিতীয়ত এই বাস্তবতা স্থাণু নয়, সচল, সদাই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের কি কোনো গতিমুখ আছে? অবশ্যই আছে, এর গতি শ্রেষ্ঠতর অস্তিত্বের দিকে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে পরিবর্তন কেবল অর্থহীন গতি নয়, প্রগতি।

আরো দেখা যায় যে আমার পক্ষে বাস্তবতা হচ্ছে সচেতন উদ্দেশ্যশীল স্থানকালের মধ্যে ক্রিয়াশীল আত্মা। এই বর্ণনার মধ্যে অবশ্য বর্ণনাতীত, আমার বুদ্ধির অগম্য যে পরম সত্য, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং এ হচ্ছে আপেক্ষিক সত্য যার মূর্তি আমার মনের পরিবর্তনের অনুসরণরত। এতে আক্ষেপের কিছু নেই। ইমার্সন বলেছিলেন বুদ্ধিহীন সঙ্গতি ক্ষুদ্র মনের পরিচায়ক। তাছাড়া পরিবর্তন ভিন্ন প্রগতি কোথায়? তবু এর মধ্যেই বাস্তবতার সম্বন্ধে আমার ব্যাপকতম ধারণার বাস, এরই ভিত্তিতে আমার জীবন অহরহ গঠিত হচ্ছে।

কেন আত্মাকে বিশ্বাস করি? কারণ এই বিশ্বাসের ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে। আমার প্রকৃতির দাবি এই আত্মায় বিশ্বাস। প্রকৃতির মধ্যে আমি উদ্দেশ্য ও বিন্যাস দেখতে পাই; নিজের জীবনে দেখি 'বিস্ফারমাণ উদ্দেশ্য'। আমার বোধশক্তি বলছে যে আমি কেবলমাত্র পরমাণুর স্তূপ নই। আমি দেখতে পাচ্ছি যে বাস্তবতা কেবলমাত্র

বিভিন্ন অণুপরমাণুর এলোমেলো সংযোগ নয়। তাছাড়া বাস্তবকে আমি যেভাবে বুঝি তাকে এর চেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। বস্তুতপক্ষে এই ব্যাখ্যা হচ্ছে বুদ্ধি ও নীতির প্রয়োজন, আমার জীবনের জন্য, অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন।

বিশ্ব হচ্ছে আত্মার প্রকাশ, এবং আত্মার মতো সৃষ্টিও অমর। সৃষ্টি কোথাও থেমে যেতে পারে না। বৈষ্ণবী নিত্যলীলার ধারণার সঙ্গে এ ধারণার মিল আছে। সৃষ্টি পাপজাত নয়, শঙ্করবাদীর মতানুযায়ী অবিদ্যার ফল নয়। সৃষ্টি হচ্ছে অমর শক্তির অমর লীলা, দৈবলীলা বলতে চান বলুন।

প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি অভিজ্ঞতাকে যেমনটি পাচ্ছি তেমনটি মেনে না নিয়ে আবার বাস্তবের মূল প্রকৃতি বা এজাতীয় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন? এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। যে মুহূর্তে আমরা অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করি, সে মুহূর্তে আমাদের আমি—যার মন গ্রহণ করছে, আর আমি-বহির্ভূত—যা কিছু আমাদের ধারণা জন্মাচ্ছে, অভিজ্ঞতার ভূমি রচনা করছে—তাকে ধরে নিতে হয়। আমি-বহির্ভূত অস্তিত্বকে মেনে নিতেই হবে, চোখ বুজে থাকলেই তাকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই অস্তিত্ব, এই বাস্তব আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতার পশ্চাতে রয়েছে, তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাতেই আমাদের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক মূল্য বোধ নিরূপিত হয়।

না, অস্তিত্বকে অবহেলা করা চলে না। তার প্রকৃতিকে জানবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে, যদিও পূর্বেই বলেছি যে সেই জানাকে পরম জ্ঞান আখ্যা দিলে চলবে না। এই আপেক্ষিক সত্যই আমাদের জীবনের ভিত্তি তা যত পরিবর্তনশীল হোক না কেন।

—তবে বাস্তবকে পূর্ণ করে রয়েছে এই যে চেতনা, এর প্রকৃতি কি?

রামকৃষ্ণ বলেছিলেন কয়েকজন অন্ধের হস্তীবর্ণনার কথা। যে অঙ্গে যে স্পর্শ করেছে সে সেই অনুসারেই রূপ বর্ণনা করেছে হাতির, অপরের সঙ্গে প্রবল তর্ক করেছে। আমার মতে বাস্তবতার অধিকাংশ ধারণাই আংশিকভাবে সত্য, আসল প্রশ্ন হচ্ছে কোনটাতে সত্যের ভাগ সবচেয়ে বেশি। আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। কি বিশ্বজগতের কি মানবজীবনের, উভয়েরই মূলে প্রেম। এই ধারণাও যে অপূর্ণ তা জানি, কারণ প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা কী তা বলতে পারব না, পরম সত্যকে জানার স্পর্ধা নেই, যদি বা সে জানা মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয়। তবু সমস্ত অপূর্ণতা সত্ত্বেও আমার কাছে এই ব্যাখ্যাই সবচেয়ে সত্য, এবং এই জ্ঞানই পরম জ্ঞানের সবচেয়ে নিকট।

প্রশ্ন উঠবে বাস্তবতার মূলে প্রেম একথা পাই কোথায়। মানতেই হবে যে আমার নির্ণয় পদ্ধতি মোটেই সনাতন নয়। আমার সিদ্ধান্ত এসেছে কিছুটা জীবনের বুদ্ধিগত বিচার থেকে, কিছুটা বুদ্ধিবহির্ভূত প্রত্যক্ষ বোধ থেকে, কিছুটা ব্যবহারিক বিবেচনা থেকে। আমার চারদিকে দেখতে পাই প্রেমের লীলা; নিজের ভিতরেও দেখি তারি প্রকাশ। নিজের পূর্ণতার জন্য প্রেমের প্রয়োজন বোধ করি, জীবনকে গড়ে তোলার একমাত্র ভিত্তি পাই প্রেমে। বিভিন্ন চিন্তায় আমাকে একই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়।

উপরে বলেছি যে মানবজীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। জীবনে প্রেমের এত অভাব যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হয়তো প্রবল আপত্তি উঠবে। কিন্তু এটা স্ববিরোধী কথা নয়, মূল ভিত্তির এখনো পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়নি, স্থানকালের মধ্যে নিত্যই তার প্রকাশ বিস্ফারমাণ। বাস্তবের মূলে প্রেম, বাস্তবের মতোই সে নিত্য পরিবর্তনশীল।

এই বিকাশের প্রকৃতি কি? প্রথমত, এর গতি কি অগ্রগতি?

দ্বিতীয়ত, এই গতির পশ্চাতে কি কোনো ধ্রুব নিয়ম আছে? এই বিকাশ হচ্ছে অগ্রগতিশীল। এটা একটা অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়। প্রকৃতির ও জীবনের পর্যবেক্ষণের দ্বারা বোঝা যায় যে চতুর্দিকেই অগ্রগতি চলছে। প্রগতি সরাসরি এক লাইনে চলেছে এমন নয়। তার পথে বাধা আসছে নিয়তই। কিন্তু মোটের উপর অর্থাৎ দীর্ঘকালীন দৃষ্টিতে দেখতে গেলে প্রগতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। এই বুদ্ধিগত বিচার ব্যতীত বুদ্ধিবহির্ভূত প্রত্যক্ষ জ্ঞান রয়েছে যে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এগিয়ে চলেছি। জৈব ও নৈতিক কারণে প্রগতির প্রতি বিশ্বাস রাখাও আমাদের পক্ষে অনিবার্য প্রয়োজন।

যেমন বাস্তবের প্রকৃতি জানা ও বর্ণনা করার জন্য নানা চেষ্টা হয়েছে তেমনি প্রগতির নিয়মকে জানার জন্যও। এজাতীয় কোনো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় না, কারণ তার মধ্য দিয়ে সত্যের কিছুটা হদিস মেলে। হিন্দু সাংখ্যদর্শন সম্ভবত বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রথম প্রয়াস। এই সমাধানে আধুনিক মন সন্তুষ্ট হয় না। আধুনিক যুগে বিবর্তনের বহু ব্যাখ্যা বা বর্ণনা চালু হয়েছে। স্পেন্সর প্রমুখ অনেকের মতে বিবর্তন হচ্ছে সরল থেকে জটিলের দিকে গতি। ফন হার্টমান্ ও অন্যান্য অনেকের মতে জগৎ এক অন্ধ শক্তির দ্বারা চালিত, সুতরাং তার অন্তর্নিহিত কোনো নিয়মের সন্ধান করা বৃথা। বর্গ্‌সঁর মতে বিবর্তন হচ্ছে সৃষ্টিশীল, তার মোড়ে মোড়ে পরিবর্তন, এবং সেই পরিবর্তনকে পূর্ব থেকে জানা যায় না।

অপরপক্ষে হেগেলীয় ধারণায় বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বাহ্যজগতে ও অন্তর্জগতে উভয়েই দ্বান্দ্বিক। সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রগতি। প্রতি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, সমাধানেই ...রি

নিবৃত্তি। কিন্তু তা থেকেই আবার প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, ইত্যাদি। প্রতি ব্যাখ্যার মধ্যেই সত্যের বীজ আছে। প্রতি দার্শনিকই নিজের দৃষ্টি অনুযায়ী সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু হেগেলের ব্যাখ্যাই যে সত্যের নিকটতম প্রকাশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্যান্য ব্যাখ্যা অপেক্ষা এতেই শ্রেষ্ঠতর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তবু সমগ্র সত্য এতেও নেই কারণ প্রতি ঘটনা এর সঙ্গে মেলে না। বাস্তবতা এত বৃহৎ যে আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তার স্থান কুলোয় না। তাহলেও বৃহত্তম সত্য যে ধারণায় আছে তারি ভিত্তিতে জীবনকে গড়ে তোলা চাই। পরম জ্ঞানকে জানি না বা জানা যায় না বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা চলে না।

সুতরাং চেতনাই বাস্তব, আর চেতনার মূল হচ্ছে প্রেম, যার বিকাশ নিয়তই চলেছে সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়ে।

সুভাষচন্দ্রের চিঠি

মায়ের প্রতি সুভাষচন্দ্রের যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে প্রভাবতী দেবীকে লেখা তাঁর এই চিঠিগুলিতে। মায়ের প্রাণে এইসব চিঠি কী বিশেষ ভাবের সঞ্চার করেছিল কে জানে, মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই চিঠিগুলি তিনি হাতছাড়া করেননি, অন্তিম-শয্যায় বিভাবতী দেবীর (শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর) কাছে গচ্ছিত রেখে যান। অল্প বয়েসেই যে আশ্চর্য পরিণত ও ধর্মপিপাসু মন ছিল সুভাষচন্দ্রের তার অকাট্য প্রমাণ মেলে এই চিঠিগুলিতে। সবসুদ্ধ নয়খানা চিঠি আছে এই সংকলনে, দুঃখের বিষয় প্রত্যেকটাই তারিখ-বিহীন। তবে হিসেব করে রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন নয়। এই চিঠিগুলি সুভাষচন্দ্র যখন লিখেছিলেন তখন তাঁর বয়েস ছিল পনেরো থেকে ষোলো। কারণ, দ্বিতীয় চিঠিতে দেখবেন মেজদা শরৎচন্দ্রের বিলাত যাওয়ার উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকেই আমরা জানতে পাই তিনি প্রথম বিলাতযাত্রা করেন ১৯১২ সালে। এবং যেহেতু সুভাষচন্দ্রের জন্মকাল ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি, সেহেতু এই চিঠিগুলি সুভাষচন্দ্র যে পনেরো থেকে ষোলো বছর বয়েসে লিখেছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।

বালক সুভাষচন্দ্রকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল সারদা নামে

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়— 　　　　কটক। বৃহস্পতিবার।

পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণকমলেষু—

মা, অনেকদিন হইল আপনাকে কোনও পত্র লিখি নাই তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। দাদা এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। তাঁহার কি এবার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না।

ভগবানের দয়ার অভাব নাই—দেখিতে গেলে জীবনের প্রতিমুহূর্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝিব বা কি করিয়া? দুঃখে পড়িলে তাঁহাকে ডাকি—অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি—কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল—যেই সুখের আলোক আসিতে লাগিল—অমনি আমাদের ডাকা বন্ধ হইল

সুভাষচন্দ্রের হস্তলিপি